# সুরের গুরু

( রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক প্রবন্ধাবলী )

অমিয়কুমার সেন ॥ নীলিমা সেন

অনন্য প্রকাশন

৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট ( দ্বিতল )

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ১৯৬৫

প্রকাশক :
হীরক রায়
অনন্য প্রকাশন
৬৬, কলেজ স্ট্রীট ( দ্বি-
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়

মূল্য :
~~সাধারণ সংস্করণ ১২.০০~~
শোভন সংস্করণ ১৬.০০

স্বর্গতা পঙ্কজিনী গুপ্ত

ও

স্বর্গত ললিত মোহন গুপ্তের

স্মৃতির উদ্দেশে

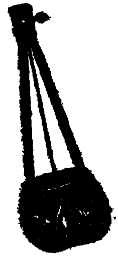
"সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা,
মোরা সুরের কাঙাল এই আমাদের ভিক্ষা।"

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ

দেখেছি যেতে যেতে ( যন্ত্রস্থ )

# সূচী



সংস্কৃতি-প্রবাহের প্রধান বাহন তিনটি—সংগীত, চিত্রকলা ও সাহিত্য। এই তিনটির মধ্যে যদিও সাহিত্য সবচেয়ে অর্বাচীন তবুও সংস্কৃতির সাহিত্য-বাহনেরই বর্তমানে প্রসার এবং প্রভাব সবচেয়ে বেশি। অথচ সংগীতকে আশ্রয় করেই মানুষের ভাষা একদিন সাহিত্যের পথে যাত্রা করেছিল। চিত্রকলা সংগীতের থেকে প্রাচীন না হলেও সাহিত্যের ভাষার থেকে অবশ্যই প্রাচীন। কিন্তু সংগীত ও সাহিত্য থেকে সে সর্বদা তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছে। ভাষার সাহায্যে চিত্র রচনা বা রেখারঙের কারিগরিতে সংগীতের মাধুর্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। মণীষী চিত্রশিল্পীর সৃষ্টিকার্যে আমরা বারবার তার পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু চিত্রের সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের বা সংগীতের সুরের কোনো অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নেই। সংগীতের ধাত্রীত্বে সাহিত্যের শৈশব অতিক্রান্ত হবার পর সাহিত্যও তার যৌবনে নিজস্ব মহিমায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু অনেক জন্মের স্বতন্ত্র



২

গৌরব আয়ত্ত করে সাহিত্য আবার সংগীতের সঙ্গে "অর্ধনারীশ্বর" মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতে তার চরমতম বিকাশ।

অর্ধনারীশ্বররূপী সাহিত্য-সংগীত বা সংগীত-সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর মতে, আমাদের দেশে সংগীতের দুটি ধারা। একটি বিশুদ্ধ রাগাশ্রয়ী; কথার বাহন তার যদি কিছু থেকে থাকে তবে সে কথাটুকু নিতান্তই গৌণ। সুরের সেটি ক্ষণিক অবলম্বন, চিরন্তন আশ্রয় নয়। কথাকে পরিবর্তিত করে দিলেও সেখানে সুরের গৌরবের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। পাশ্চাত্ত্য সাধু সংগীতও এই শ্রেণীর। তার বাচ্যাংশ নিতান্ত আটপৌরে এবং মামুলি। সুরের থেকে তাকে আলাদা করে নিলে সে-কথার দারিদ্র্য মনকে পীড়িত করবে। কিন্তু আমাদের দেশে সংগীতের আর একটি ধারা আছে যেখানে সংগীত ভাষাকে আশ্রয় করেছে না ভাষা সংগীতকে আশ্রয় করেছে সেটা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। দুজনের স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে, কিন্তু দুজনের মিলিত মর্যাদার তাৎপর্য সীমাহীন। রবীন্দ্রসংগীত এই সীমাহীন তাৎপর্যের ঘননিবদ্ধ রূপ। রবীন্দ্রসংগীতের দাক্ষিণ্যে আমরা সংস্কৃতির একটি নূতন জগতের সন্ধান পেয়েছি এবং 'এই জগৎ-পারাবারের তীরে' আমাদের অজ্ঞাতেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রতি আহ্বান ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

সেটা কি উপায়ে সম্ভব হল বোধহয় একটু বিশদভাবে বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্র-জীবনীর নৈমিত্তিক পাঠকরাও একথা জানেন যে শৈশব থেকে তাঁকে হিন্দুস্থানী মার্গ-সংগীতের তালিম নিতে হয়েছিল। তবে তৎকাল প্রচলিত হিন্দুস্থানী সংগীত তাঁর হৃদয়কে তেমন করে ভরাতে পারেনি। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল রাগরাগিনীগুলিকে তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন একথা ভুলে গেলে চলবে না।

শুধুমাত্র "ছিন্নপত্রাবলী" থেকে উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে বিশুদ্ধ ভারতীয় রাগ-রাগিনীগুলি তাঁকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

"ভৈরবী সুরের মোচড়গুলি কানে এলে জগতের প্রতি এক বিচিত্র ভাবের উদয় হয়…মনে হয় একটা নিয়মের হস্ত অবিশ্রাম আর্গিন যন্ত্রের হাতা ঘোরাচ্ছে এবং সেই ঘর্ষণ-বেদনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গম্ভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে—সকালবেলাকার সূর্যের সমস্ত আলো ম্লান হয়ে এসেছে, গাছপালারা নিস্তব্ধ হয়ে কী যেন শুনছে, এবং আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী অশ্রুর বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—অর্থাৎ দূর আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় যেন একটা অনিমেষ নীল চোখ ছলছল করে চেয়ে আছে। (জুন ১৮৮৯)

আবার

"ভারতবর্ষে যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূর বিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই জন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম ঔদাস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে। এইজন্যে আমাদের পূরবীতে কিংবা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হা-হা ধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে যেটা কর্মপটু স্নেহশীল সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায়নি। পৃথিবীর যে-ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মিড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে।" (৬ মাঘ, রবিবার ১২৯৭ [১৮৯১])

অন্যত্র

> "আমাদের মূলতান রাগিণীটা এই চারটে পাঁচটে বেলাকার রাগিণী, তার ঠিক ভাবখানা হচ্ছে—'আজকের দিনটা কিছুই করা হয়নি'...আজ আমি এই অপরাহ্নের ঝিকিমিকি আলোতে জলে স্থলে শূন্যে সব জায়গাতেই সেই মূলতান রাগিণীটাকে তার করুণ চড়া অন্তর সুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—না সুখ, না দুঃখ, কেবল আলস্যের অবসাদ এবং তার ভিতরকার মর্মগত বেদনা।" (২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫)

"সংগীতের মুক্তি" নামক প্রবন্ধে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে বিধৃত এবং তার থেকে আহৃত আমাদের রাগরাগিনীর স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

> "আমাদের মতে রাগরাগিনী বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য আছে। সেইজন্য আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, তাহা যেন সমস্ত জগতের। ভৈরো যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথের পথ-বিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা, মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তি-নিশ্বাস, পূরবী যেন শূন্যগৃহ-চারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।"

আমাদের মার্গ-সংগীতের রাগরাগিনীর তাৎপর্য এবং রূপরসটি এত নিবিড় করে বুঝেছিলেন বলেই একটি জিনিষ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ-ভাবে ব্যথিত করেছিল। সেটি হিন্দুস্থানী গানে এই রাগ-রাগিণীর বাণী বাহনটির নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরতা। গানের সুরকে বহন করতে হলেই বাণীকে আপন গৌরব বিসর্জন দিতে হবে একথা রবীন্দ্রনাথ

মানেন নি। এই গৌরব বিন্দুমাত্র খর্ব না করেও বাণী বহু স্থলে সুরকে বহন করেছে তার উদাহরণ আছে। "কথা ও সুর" প্রবন্ধে একথা তিনি অনুনকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

> "আমাদের দেশে সাহিত্যবর্জিত সংগীত কণ্ঠের বা বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের আলাপে প্রকাশ পায়। বিখ্যাত গুণীদের রচিত সংগীতের মহৎ রূপসৃষ্টি বলে তারা বিশেষ শিল্প-আকারে রক্ষিত ও কালে কালে ঘোষিত হয়ে আসেনি। তানসেন প্রভৃতির রচনা নানা কণ্ঠে পরিবর্তিত ও বিকৃত হতে হতে যুগপ্রবাহে ভেসে এসেছে বাক্যের তরী আশ্রয় করে। অনেক স্থলেই সে তরী সামান্য ডিঙি বা ভেলা। কাজ চালাবার জন্য যাঁরা সে তরী বানিয়েছেন তাঁরা যদি সে-তরীকে অকিঞ্চিৎকর না করে শিল্পভূষিত করতে পারতেন তাহলে বাহনের উৎকর্ষে আরোহীর সম্মানের লাঘব হতই যে তা কেমন করে বলব? তানসেন প্রভৃতির গানে সাহিত্যের উৎকর্ষ যে সর্বত্র উপেক্ষিত হয়েছে তাও তো সত্যি নয়। একথা মনে রাখতে হবে, সংগীতের সেবকতায় বাক্যকে গৌণভাবে আশ্রয় করলেও বাক্য আপন ধর্ম সম্পূর্ণ ভুলতে পারে না, তার অর্থের জীর্ণ চীরের মধ্য দিয়েও সাহিত্যের কুলশীল বেরিয়ে পড়ে।"

কিন্তু সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের শৈশবে প্রচলিত হিন্দুস্থানী সংগীতের বাচ্যার্থটি এতই অকিঞ্চিৎকর ছিল যে, রবীন্দ্রনাথ মন তাতে কখনই পরিতৃপ্ত হতে পারেনি। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে বাচ্যার্থের এই অপরিণত রূপ প্রায় সর্বত্রই সুরের গভীর অর্থকে বিস্তৃতি না দিয়ে তাকে নিয়তই সংকুচিত করে আনছিল। এর বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি করে। বাংলা দেশের কীর্তনকে তিনি সম্মান দিয়েছিলেন একারণে যে সে-গানে সুর এবং

কথা একে অপরকে পরিণত আকারে প্রকাশ করায় সাহায্য করছিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি খুব স্পষ্ট—

> "কীর্তন সংগীত আমি অনেককাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে প্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সংগীতে এমন সহজ ভাবে আছে বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু শাখায় প্রশাখায় ফুলে ফুলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তন সংগীতে বাঙালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।" ( ২৯ জুলাই ১৯৩৬॥ দিলীপ কুমার রায়কে লিখিত। )

কীর্তনের যে অনন্যতন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির হয়ে গৌরব অনুভব করেছেন, সে অনন্যতন্ত্র তাঁর রচিত সংগীত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কীর্তন গানে সাহিত্যে ও সুরের সম্মিলন তাঁর সংগীত রচনার আদর্শ ছিল। শুধু তাই নয়, কীর্তন গানে যে ধর্মীয় গণ্ডী ছিল তার থেকে কীর্তনের সুরকে তিনি মুক্তি দিয়েছেন। এই সুরকে নিছক প্রকৃতি বর্ণনার বা জাগতিক প্রেমের তরীতে আনন্দানুভূতির স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন।

ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষা-অঞ্চলের বা ভারতের বাইরের রবীন্দ্রানুরাগীরাও অনেক ক্ষেত্রে একথা শুনে আশ্চর্য হন যে, গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি গানরূপেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু সুর পারাপারের এই সাহিত্য তরীটি সুরবিহীন সাহিত্য রাজ্যে স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোনো কোনো মহলের সাহিত্য সমালোচকের অভিমত যাই হোক না কেন, একথা নিশ্চিত যে রবীন্দ্র-প্রতিভার সাংগীতিক এবং সাহিত্যিক সম্ভাবনা "গীতাঞ্জলি"-তেই নিঃশেষিত

হয়ে যায়নি। পরবর্তী রচনার সঙ্গে আজও বাংলার বাইরের পাঠকদের তেমন করে পরিচয় ঘটেনি। কিন্তু সেগুলি সাহিত্যকৃতিতে গীতাঞ্জলিকে বহু যোজন পশ্চাতে ফেলে এসেছে। গীতাঞ্জলি পর্বের গানের সুরও পরবর্তী সাহিত্য-সংগীতে গভীরতর হয়েছে। রবীন্দ্র-সংগীতের এই সাহিত্য সম্মিলন বাংলাদেশের তথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এই সূচনার স্পষ্টতর স্বাক্ষর অধুনা "বাংলাদেশের" স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও রাজনৈতিক অসন্তোষের আকারে যুদ্ধের উন্মাদনার মধ্যেই "বাংলাদেশের" স্বাধীনতা আন্দোলনের বহিরঙ্গ প্রকাশ। তবু একথা আজ আর অজানা নেই যে এ-আন্দোলন বহুলাংশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আর এ আন্দোলনের আয়ুধ ছিল রবীন্দ্র-সংগীতরচিত নূতন সংস্কৃতি। ধর্মের গণ্ডী, সাম্প্রদায়িক বিভেদ এবং রাজনৈতিক চেতনার ঊর্ধ্বে রবীন্দ্রসংগীত-সংস্কৃতি জয়ী হয়েছে এটা সমগ্র বাঙালিজাতির গৌরব।

সব সভ্যতা সকল সংস্কৃতির জীবনেই সংকটময় মুহূর্ত আসে। এই সংকটের কারণ বহুবিধ। কিন্তু অনেক সময় সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদানের কোনোটির নিজের মধ্যেই সে-সংকটের বীজ নিহিত থাকে। এই উপাদানের কতকগুলি নিতান্তই সাময়িক, যে যুগে সেগুলি সংস্কৃতির বলে গৃহীত হয়েছিল সে-যুগ উত্তীর্ণ হয়ে বেঁচে থাকার মতো জীবনী-শক্তি তাদের থাকে না। কিন্তু সংস্কৃতির নূতন উপাদান সৃষ্টি হয়ে তাদের স্থান পূর্ণ না করা পর্যন্ত এগুলির অভ্যাস ত্যাগ করা যায় না। সংস্কৃতি তখন জীর্ণ সংস্কারে পরিণত হয়। এটা সংস্কৃতির একধরণের সংকট। কোনো সময় আবার সভ্যতার চিরাচরিত সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি সময়োপযোগী রূপান্তর গ্রহণ করতে পারে না বলেই নিকৃষ্ট অথচ নূতনতর বাইরের সংস্কৃতির সংঘাতে নির্জীব হয়ে পড়ে। তখন বহিরাগত সংস্কৃতির আপাতরমণীয় উপাদানগুলি

বেশী গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এটাও সংস্কৃতির অন্য ধরণের সংকট।

ইংরেজ অধিকারের সূচনায় আমাদের দেশে সংস্কৃতির এই উভয়-বিধ সংকটই দেখা দিয়েছিল। আমাদের সংস্কৃতির অনেক উপাদান তখন বহুব্যবহারে জীর্ণ। আবার অনেক চিরন্তন উপাদান পশ্চিমের নূতন সংস্কৃতির জৌলুষে ম্লান। সংকট মোচনের চেষ্টা অবশ্য ভারত-বাসীর নিজের মধ্যেই জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। এই চেষ্টায় কেউ কেউ অতিমাত্রায় প্রাচীনপন্থী হয়ে উঠেছিলেন, কেউ আবার বিদেশী সংস্কৃতির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেওয়াকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে সংস্কৃতির একটি নূতন যুগোপযোগী কাঠামো আমরা সৃষ্টি করেছিলাম। আমাদের সংস্কৃতির নিত্য উপাদানগুলির সাময়িক পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন এবং বিদেশী সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্য উপাদানগুলির স্বীকরণ এই নূতন সংস্কৃতিতে বিধৃত হয়েছে। সংস্কৃতির সংকট এবং নবরূপায়ণের সময় দেশজ আরও এক শ্রেণীর উপাদান আমাদের সহায়তা করে। সেগুলি আপাত উপেক্ষিত লোকসংস্কৃতির উপাদান। সাধু সংস্কৃতিকে আসর জাঁকিয়ে বসতে হয় বলে তার মধ্যকার স্থিতিস্থাপকতা অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায়। এজন্যই অনেকসময় তাদের উপযোগিতা খর্ব হয় এবং বাইরের ক্ষুদ্র আঘাতেই তাদের দেহান্ত ঘটে। কিন্তু লোক-সংস্কৃতির উপাদানগুলির শিকড় দেশের মাটিতে আবদ্ধ বলেই সময়ের নানা বিরূপতা কাটিয়ে ওঠা তাদের পক্ষে সহজ হয়, প্রয়োজনমত রূপান্তরিত হয়ে তারা দেশের মর্মস্থানটি আঁকড়ে ধরে থাকে। আধুনিক যুগে আমাদের সংস্কৃতির রূপান্তরের মধ্যে লোক-সংস্কৃতির উপাদানগুলি বিশেষ ভাবে অনুস্যূত হয়ে আছে।

রবীন্দ্রসংগীত রূপান্তরিত আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক একথা

আমরা আজও তেমন করে উপলব্ধি করিনি। সংস্কৃতির সংগীত-বাহনটির ক্লাসিক্যাল ধারাকে সর্বসাধারণের অনধিগম্য করে তাকে যে দরবারী আসন দেওয়া হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথই এযুগে প্রথম তাকে সে অনধিগম্যতা থেকে উদ্ধার করে আমাদের দৈনন্দিন ভালোলাগা মন্দলাগার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। প্রেমের অন্তরতম প্রকাশকে মার্গ-সংগীতের সুরের যোগে গভীরতম করে তুলেছেন, প্রকৃতির নিত্য নৃত্যলীলাকে এই সুরগুলির সঙ্গে সমন্বিত করে বিশ্বের সৃষ্টি মাধুর্যকে নূতনতর ভাষা দিয়েছেন, আর ভগবৎ প্রীতিকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডী থেকে মুক্তি দিয়ে তার অনন্তরূপটিকে আমাদের চোখে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের এই নূতন সংস্কৃতির জগতে বিদেশী সংগীত অপরিচিত বলে উপেক্ষিত হয়নি। বিদেশী সুরের অন্তর্নিহিত আনন্দ-বেদনাকে তিনি দেশী-ভাষার সংযোগে আমাদের গ্রহণীয় করে তুলেছেন। বিদেশী সংগীতের মর্মস্থলে প্রবেশ করা সহজ নয়, এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরিমিত সংকোচবোধও ছিল। তবু তাঁর প্রতিভা সে মর্মের সন্ধান পেয়েছিল। "জীবনস্মৃতি"র একটি উক্তি থেকে সংকলন করে দিলে একথা স্পষ্ট বোঝা যাবে।—

> "য়ুরোপীয় সংগীতের মর্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি। একথা বলা আমাকে সাজে না। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত, এ সংগীত রোমান্টিক্··· রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক, তাহা অবিরাম গতিচাঞ্চল্যের উপর আলোক ছায়ার দ্বন্দ্ব সম্পাতের দিক···। ···আমি যখনই য়ুরোপীয় সংগীতের রস ভোগ করিয়াছি তখনই বারম্বার মনের মধ্যে বলিয়াছি, ইহা

রোমান্টিক। ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপীয় সুরকে কোনো স্থানে অবলম্বন করেছেন কিন্তু তার চেয়েও বেশি অধিগত করেছেন এই সংগীতের মধ্যে বিচিত্রতাকে। ইয়োরোপীয় সংগীতের নির্যাসটিকে তিনি আমাদের গানে সঞ্চারিত করেছেন কিন্তু তার ভারতীয় মূলটিকে তিনি উৎপাটিত করেননি।

রবীন্দ্রসংগীত সংস্কৃতির সংগমে আরও একটি ধারা এসে মিলিত হয়েছে। সেটি আমাদের লোকসংগীতের ধারা লোকসংগীতের সারল্য এবং গভীরতা রবীন্দ্রনাথকে শিশু বয়স থেকেই মুগ্ধ করেছিল। সে সুরগুলি এত প্রত্যক্ষভাবে আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বলেই রবীন্দ্রসংগীত সংস্কৃতির জগতে তার মূল্য অপরিসীম। আমাদের গ্রামীন বাউল ভাটিয়ালি প্রভৃতি এবং প্রয়োজন মতো অন্যান্য প্রদেশের লোকসংগীতের সুরগুলির সারল্য যে গভীর অর্থ বহনের আধুনিক বাহন হতে পারে, রবীন্দ্রসংগীতে তার নিগূঢ় পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। সেজন্যই রবীন্দ্রসংগীত আমাদের সংস্কৃতিকে নূতন সমৃদ্ধির দ্বার প্রান্তে এনে উপস্থিত করে দিয়েছে।

নৃত্য এবং অভিনয়কলাও সংস্কৃতির অন্যতম বাহন। এরা প্রথম যুগে সংগীতের অনুবর্তী হয়েই সংস্কৃতির জগতে প্রবেশ লাভ করেছিল; নৃত্য ক্রমে সংগীতের সাহচর্য রক্ষা করেও স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অভিনয়কলা সংগীতের সাহচর্য ত্যাগ করে ক্রমে সাহিত্যের অনুসারী হয়েছে। অভিনয় কলার সাংগীতিক রূপের থেকেও তার সাহিত্যিক রূপই এখন প্রধান।

রবীন্দ্র সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে এদুটি বাহনেরও প্রভূত রূপান্তর

ঘটেছে। ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য কুণ্ডের মতো প্রবাহহীন আধারে আবদ্ধ হয়ে সংস্কৃতি প্রসারের কাজের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিল অথচ লৌকিকনৃত্য সাধু আসরের উপযোগী পরিমার্জনার অভাবে অবহেলিত হচ্ছিল। দুটি ধারাকেই রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্য-সাহিত্যে সমন্বিত করেছেন।

নৃত্যনাট্যগুলি রবীন্দ্র প্রতিভার পরিণত বয়সের সৃষ্টি। এগুলি সম্বন্ধে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটা চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, "সুরের বোঝাই করা তিনটি নাটিকার মাঝিগিরি শেষ করা গেল।" নৃত্যকে সুরের সঙ্গে সমন্বিত করার নানা রীতি সাহিত্য-এবং সংগীত-জগতে প্রচলিত। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যে তার নানারূপ দেশে দেশে এবং কালে কালে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। সে-সব কোনো রীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ একক আনুগত্য প্রকাশ করেননি। নৃত্যকে তিনি মনে করতেন; "দেহভঙ্গির সংগীত।" দেহভঙ্গির সংগীত এবং কণ্ঠের গভীরতম সংগীতের এত নিবিড় মিলন আর কোথাও সম্ভব হয়েছে কিনা জানিনা। কিন্তু রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে এ মিলনের আনন্দে পূর্ণ। আরও একটি বিষয় বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই নৃত্যনাট্যগুলিতে নৃত্যের সংগীত বাহনটি তার বাচ্যার্থের সাহিত্যিক মর্যাদা বিন্দুমাত্র হারায়নি, বরঞ্চ ত্রিবেণী-সংগমে এসে গভীরতর হয়েছে। অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়। শুধু একটি মাত্রের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি নিবন্ধ করব। 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে অর্জুন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পর চিত্রাঙ্গদার বেদনাকে বসন্ত বিরহের দৃশ্যে স্থাপিত করা হয়েছে। "রোদন ভরা এ বসন্ত" এই গানটি বিরহ-বেদনাকে রূপ দিয়েছে। গানের সুর, তার সাহিত্যিক গভীরতা এবং নৃত্যের বিরহানুগ ব্যঞ্জনা আমাদের চেতনাকে আবর্তিত করে ইন্দ্র-লোকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য সংখ্যায় অপ্রচুর হলেও আমাদের সংস্কৃতির জগতে তাদের ভাবমূর্তি একটি

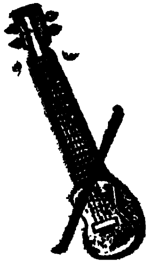
নূতন অধ্যায় যুক্ত করেছে। অক্ষম অভিনয় এবং ততোধিক অক্ষম অনুকরণে এই ভাবমূর্তিটি যেন নষ্ট না হয়ে যায় সংস্কৃতিবান বাঙালির এ বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

অভিনয়কলাকেও রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক এবং ভবিষ্যৎ সংস্কৃতির নিষ্কলুষ বাহন হিসেবে সৃষ্টি করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের শৈশবে প্রচলিত নাট্যকলাকে তিনি কিভাবে রূপান্তরিত করেছেন সেকথা সততই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। রঙ্গমঞ্চের বিরল অথচ ব্যঞ্জনাময় দৃশ্যসজ্জা, নটনটীদের রুচিসম্মত অঙ্গসজ্জা প্রভৃতি বহিরঙ্গ রূপ তাঁরই প্রতিভার দান। কিন্তু নাট্যকলার তৎকাল প্রচলিত অতি নাটকীয়তাকে সাংগীতিক অভিব্যক্তিতে অতিক্রম করার যে রীতি রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত করেছিলেন তার উত্তরাধিকার বহন করার দায়িত্ব পরবর্তী সাহিত্য সমাজের কেউ আজও তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তবু রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি একইভাবেই আমাদের সাংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। নাট্যরচনায়ও তিনি প্রাচীন ভারতীয় নাট্যাদর্শের সঙ্গে নূতনতর পাশ্চাত্যরীতির নির্যাসটিকে সমন্বিত করেছেন। উপরন্তু আমাদের দেশজ লৌকিক নাট্যকলার সহজ ভঙ্গিটিকে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেছেন। নাটকের সাংগীতিক সম্ভাবনাটির বিকাশই তাঁর নাট্যরচনার আদর্শ। বস্তু নাটকের বক্তব্য তার বাচ্যার্থ-কে প্রচ্ছন্ন রেখে একটি সংগীতময় ব্যঞ্জনায় আমাদের হৃদয়ের তটকে প্লাবিত করে দেয়! তার নিহিতার্থ সংলাপ এবং ঘটনা প্রবাহকে অবলম্বন করেও তাকে অতিক্রম করে। আর সংগীতের সুরের মতোই আমাদের হৃদয়কে অধিকার করে। নাটকে সংগীতের ব্যবহারকেও তিনি নূতনতর অর্থমণ্ডিত করেছেন। উদ্দেশ্য সাধন এবং আদর্শসিদ্ধির জন্য তাঁকে নিজেই নটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে, রুচিবান্ দর্শক সৃষ্টির জন্যও কঠিন প্রচেষ্টা করতে হয়েছে। একথা আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে নাটকের বহু প্রচলিত উপাদানগুলিকে

অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাটকে সাধারণ নাটকের সঙ্গে প্রতিযোগিতার আসরে অবতীর্ণ করা মূঢ়তা, তাঁর নাটকের সংগীতগন্ধী সংলাপ এবং ব্যঞ্জনাময় সংগীতই তাকে রসলোকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারে। তার নাটকে বহিরঙ্গ সজ্জা অপ্রয়োজনীয় এবং অশালীন। তার নাটকের সংলাপ নাটকে ব্যবহৃত সংগীতের ভাষ্য আর নাটকে ব্যবহৃত সংগীত নাটকের সংলাপের গভীরতর অভিব্যক্তি।

রবীন্দ্রসংগীতের সংস্কৃতির জগৎ মাঝে মাঝে স্থূলহস্তাবলেপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু তার নিত্যমূল্য যে-অমৃতের সন্ধান দিয়েছে তার থেকে আমরা অতি সহজে ভ্রষ্ট হব এ আশঙ্কাও নেই। আমাদের চকিত ক্ষণিক ভ্রষ্টতা থেকে উদ্ধার করার শক্তি রবীন্দ্রসংগীতের মাধুর্য গভীরতা এবং দৃঢ়তার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। এই পরম প্রাপ্তি আমাদের মোহগ্রস্ত দুর্বলতা থেকে অবশেষে রক্ষা করবেই। রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই উপসংহার করছি।

> "সত্যের রসরূপটি সুন্দর ও সরল করে প্রকাশ করা যে কলাবিদ্যার কাজ অবান্তরের জঞ্জাল তার সবচেয়ে শত্রু। মহারণ্যের শ্বাস রুদ্ধ করে দেয় মহাজঙ্গল। মানুষ বারবার শিশু হয়ে জন্মায় বলেই সত্যের সংস্কারবর্জিত সরলরূপের আদর্শ চিরন্তন হয়ে আছে। আর্টকেও তেমনি শিশুজন্ম নিয়ে অতি অলংকারের বন্ধন পাশ থেকে বারে বারে মুক্তি পেতে হবে।"



গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন অভিমান মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন, "আমার সব কিছুই যদি বাঙালি ভুলে যায়, আমার গান তাকে গাইতেই হবে।" বাঙালির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের একটি লক্ষণ হল তারা অতি সহজে স্বীকার করে না। স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসও তাই আক্ষেপ করে তাঁর স্বদেশবাসীকে বলেছিলেন, "আমি মরলে আমার চিতায় দিবি মঠ।" কিন্তু একথাও মানতে হবে একবার স্বীকার করলে বাঙালি নিঃশেষেই স্বীকার করে। গান ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সৃষ্টিকেও তাই বাঙালি নিঃশেষেই স্বীকার করেছে, কিছুই ভুলে যায়নি। গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সেই গভীর প্রত্যয় তবু সত্য। রবীন্দ্রসংগীতের স্বীকরণ বাঙালির অন্তরতম স্বীকরণ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে গানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। তিনি লিখেছেন, "গান লিখতে আমার যেমন নিবিড় আনন্দ হয়,

এমন আর কিছুতেই হয় না।" এ শুধু খেলার আনন্দ নয়, এর মধ্যে পরমা প্রাপ্তির আনন্দও আছে। বিচিত্র সৃষ্টি এবং বিভিন্ন কর্মের পুরস্কার তাঁর দীর্ঘ জীবনকে নানা সার্থকতায় পূর্ণ করেছে। কিন্তু সংগীতের মধ্য দিয়েই চির আকাঙ্ক্ষিত সাধনার সিদ্ধি এবং অনন্ত আনন্দের অনুভূতি তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে। তাঁর এই বিশেষ সৃষ্টিকর্মের প্রতি পর্ব এই সাধনার গভীরতা এবং এই আনন্দের নিবিড় আস্বাদে পরিপূর্ণ। তিনি লিখেছেন,

"যবে কাজ করি প্রভু দেয় মোরে মান।
যবে গান করি ভালোবাসে ভগবান।"

আবার লিখেছেন,

"মন দিয়ে যাঁর নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে তাঁর চরণ ছুঁয়ে যাই।"

সৃষ্টির প্রথমদিনের ঊষা ধরিত্রীর অঙ্গনে নেমে এসে তাকে সুরের অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সে অন্বেষা সমস্ত সৃষ্টিকে আনন্দে বিরহে অভিষিক্ত করেছে। কবিও ধরিত্রীর সঙ্গী। সুর-মন্দাকিনীর ধারেই তিনি তাঁর আবাস খুঁজেছেন। বিশ্বতানের ধ্রুবপদটি তিনি তাঁর জীবনের গানে মিলিয়ে নিতে চেয়েছেন। গানের গানে তাঁর সমস্ত রচনা নিষিক্ত হয়ে আছে।

বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গতা গানের সুরের মধ্য দিয়ে। গানে গানে পথ কেটে তিনি সৃষ্টি রহস্যের দ্বারে এসে পৌঁছেছেন—

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন-খানি,
তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি॥

তখন তারি আলোর ভাষায়　　আকাশ ভরে ভালোবাসায়
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী ॥"

কোনো এক পাশ্চাত্ত্য কবি তাঁর প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

"Kiss me when I am dead
And I shall feel it."

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরতমকে বলেছেন,

"তোমার কাছে এ বর মাগি
মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে।"

সৃষ্টিকর্মের তিনটি বাহন, ভাষা সুর ও শিল্প। রবীন্দ্রনাথ এই তিনটি বাহনকেই চরমতম সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তিনি ভাষা ও সাহিত্যের অধীশ্বর, তাঁর "লেখনীলীলা"য় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের কয়েকটি যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি নিঃসঙ্গ শিল্পী পূর্বতন কোনো প্রতিভার উত্তরাধিকার না নিয়েই তাঁর চিত্রকলা নন্দনবাসিনী উর্বশীর মতোই একদিন আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে উঠেছিল। সে চিত্রকলার ঐতিহ্য বহন করার মতো কোনো শিল্পীও আজ পর্যন্ত আবির্ভূত হননি। কিন্তু সুরকার হিসেবে তিনি ত্রিভুবন-জয়ী। ভারতের প্রাচীন সাংগীতিক উত্তরাধিকারকে তিনি সংহত ও সমৃদ্ধ করেছেন, বর্তমানের সাংস্কৃতিক জীবনকে তাঁর সংগীত নূতন উপলব্ধি দিয়েছে, সুদূর ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় জাগতিক মহামিলনের দিকে তাঁর সংগীত প্রসারিত।

প্রতিভার দুটি বাহনকে রবীন্দ্রনাথ একই ক্ষেত্রে নিযুক্ত করতে পেরে-

ছিলেন বলে রবীন্দ্রসংগীত এত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর অনন্য সাধারণ সাহিত্য প্রতিভা এবং গভীর ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ সংগীতপ্রতিভা মিলে রবীন্দ্র সংগীত সৃষ্টি করেছে। বাংলা গানের কথার সঙ্গে সুরের মিলনকে রবীন্দ্রনাথ "অর্ধনারীশ্বর রূপ" আখ্যা দিয়েছেন। সাহিত্য ও সুরের অর্ধনারীশ্বর এই রূপটিকে তিনি নিবিড় সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, তেমনটি আজ পর্যন্ত আর কোথাও দেখা যায়নি। ভারতবর্ষের বাইরে এমন কি বাংলাদেশের বাইরে এ সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতনতা এখনও পর্যন্ত অনুপস্থিত। তবে সচেতনার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

ভারতীয় সংগীত প্রাচীনকালেই দুটি স্বতন্ত্র ধারায় বইতে আরম্ভ করেছিল। একটি সুরবাহন সাহিত্য-সংগীত। এগুলি প্রধানত মন্ত্র-জাতীয়। কথাটাই সেখানে আসল। আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা ভাগবত উপলব্ধি-জাত বাণীকে সুরের সংস্পর্শে চিরস্থায়ীত্ব দেওয়াই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্য ধারায় সুরই প্রধান, বাণীবাহন যদি তার কিছু থাকে তবে সেটা সুরকে প্রকাশ এবং প্রসারিত অবলম্বন মাত্র। এই দ্বিতীয় ধারা সুরকারদের প্রতিভায় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু অপরদিকে সাহিত্য-সংগীতের ধারা নিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল শুধু ধর্মসংগীতের চিরাচরিত কুণ্ডে। শুধু তাই নয়, ধ্রুপদী সংগীতে সুরের যেমন ঘরানা সৃষ্টি হয়েছিল, ধর্মসংগীতগুলিও তেমনি গোষ্ঠীর খবরদারী বাধা পড়ে গিয়েছিল। সেগুলি কোনো ভক্তের একক অনুভূতির চেয়ে, একটি গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানকে বেশি করে অবলম্বন করেছিল। মধ্যযুগে অবশ্য সারা ভারতবর্ষে এই সংগীত ধর্মীয় গণ্ডীকে পুরোপুরি অস্বীকার করে নয়, অবলম্বন করেই ভক্তের ব্যক্তিগত আকুলতার সঙ্গে যুক্ত হল। মোটামুটি কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের কাঠামোর মধ্যে রচিত হলেও মাঝে মাঝে সে কাঠামোর গণ্ডী ভেঙে সংগীত রচয়িতা বা সুরকারের একান্ত নিজস্ব আকুতিকে



৩

রূপ দিয়েছে। কবীর, নানক বা অন্যান্য সন্তদের দোঁহা, মীরার ভজন ইত্যাদি গান এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। সুর-নিরপেক্ষ ভাবেও এদের সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। বাণী ও সুরের সম্মিলনে এই যে নূতন সাহিত্য-সংগীতে তার পরিপূর্ণ বিকাশ বাংলাদেশেই ঘটেছে। কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, রামপ্রসাদী ইত্যাদি গানে তার বিভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়েছে। একান্ত সুর-নির্ভর সংগীত হিসেবেই নয়, পাঠযোগ্য সাহিত্য-কৃতি রূপেও তাদের সমাদর ক্রমশই বেড়ে চলেছে। রবীন্দ্রসাহিত্য এবং সংগীতে এই ধারার পূর্ণতম বিকাশ ঘটেছে। এই বিকাশের তাৎপর্য আজও পুরোপুরি স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু পৃথিবীর সংগীত বা সাহিত্য জগতে এটি একদিন আদর্শ বলে গৃহীত হবে। রবীন্দ্রসংগীত ভবিষ্যতের সে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছে।

বাংলাগানে সংগীতের বাণী বাহনটির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে একটি দীর্ঘ উক্তি দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে একটি পত্রালাপে তিনি লিখেছিলেন,

> "…পরজ-রাগিণীতে একটি হিন্দী গান জানতুম, তার বাংলা তর্জমা এই: কালো কালো কম্বল গুরুজি, আমাকে কিনে দে, রাম-জপনের মালা এনে দে, আর জলপান করবার তুম্বী।
>
> ওই ফর্দে উদ্ধৃত ফরমাশী জিনিষগুলিতে যে সুগভীর বৈরাগ্যের ব্যঞ্জনা আছে পরজ রাগিণীই তা ব্যক্ত করবার ভার নিয়েছে। ভাষাকে দিয়েছে সম্পূর্ণ ছুটি। আমি বাঙালি, আমার স্কন্ধে নিতান্তই যদি বৈরাগ্য ভর করত, তবে লিখতুম:

গুরু আমায় মুক্তিধনের দেখাও দিশা।
কম্বল মোর সম্বল হোক দিবা নিশা।
সম্পদ হোক জপের মালা,
নাম মণির দীপ্তি জ্বালা,
তুম্বীতে পান করিব যে জল
মিটবে তাহে বিষয় তৃষা॥

কিন্তু এখানে পরজ তার ডানা মেলতে বাধা পেত। পরজ হত সাহিত্যের খাঁচার পাখি। হিন্দুস্থানী গাইয়ে তানপুরা নিয়ে বসলেন, বললেন, 'আমার এই চুণরিয়া লাল রঙ করে দে; যেমন ওই পাগড়ি তেমন আমার এই চুণরিয়া লাল রঙ করে দে। ব্যস আর কিছু নয়, এই কটি কথার উপর কানাড়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব বিস্তার করলে। বাঙালি গাইলে,

ভালোবাসিবে বলে ভালো বাসিনে
আমার যে ভালোবাসা—তোমা বই আর জানিনে।
হেরিলে ও মুখশশী আনন্দসাগরে ভাসি;
তাই তোমারে দেখতে আসি দেখা দিতে আসিনে।

যা কিছু বলবার, আগে ভাগে তা ভাষা দিয়েই বলে দিলে, ভৈরবী রাগিণীর হাতে খুব বেশি কাজ রইল না।

বাঙালির এই স্বভাব নিয়েই তাকে গান গাইতে হবে, বললে চলবে না রাতের বেলাকার চক্রবাক্ দম্পতির মতো ভাষা পড়ে থাকবে নদীর পূর্বপারে আর গান থাকবে পশ্চিম পারে and never the twain shall meet। বাঙালির কীর্তন গানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল—তাকে প্রিমিটিভ এবং ফোক্ মুজিক বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। উচ্চ অঙ্গের কীর্তন গানের

> আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুরূহ ; তার পরিসর হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে বড়ো। তার মধ্যে বহু শাখায়িত নাট্য রস আছে তা হিন্দুস্থানী গানে নেই। ( ৬ই জুলাই, ১৯৩৫ )

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে রবীন্দ্র দৃষ্টিতে বাংলা গানের বিশেষ রূপটি বোঝা যাবে। সুর প্রয়োগ সম্বন্ধে কিন্তু তাঁর সাহিত্যপ্রীতি তাঁকে উদাসীন করে রাখেনি। পুনরুক্তির বাহুল্য এবং চিরাচরিত হিন্দুস্থানী মার্গ সংগীতের সুর বিস্তারের রীতি থেকে সৌকুমার্য এবং ভাব গভীরতাকে অনেক ক্ষেত্রেই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দিয়ে সে সুরের অন্তর্নিহিত রূপটি যেমন করে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন, তেমন আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ। খুব অল্প বয়সেই তাঁর দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয়েছিল।

১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে বিলেত যাত্রার পূর্বে তিনি বেথুন সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বৎসর। অল্প বয়সের সেই প্রবন্ধটিতে ভারতীয় সংগীতের প্রচলিত রাগরাগিণী-গুলির ব্যঞ্জনাকে দীর্ঘকালের বিস্মৃতি থেকে মুক্তি দিয়ে ভাবপ্রকাশের বাহন হিসেবে সেগুলিকে সাহিত্যের সঙ্গী করে তোলার সংকল্প প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিনের দুঃসাহসী তরুণ জীবনের পূর্ণ সাধনায় সে মুক্তির পথ চিহ্নিত করে গিয়েছেন। নূতন যুগের সাংস্কৃতিক সংগীতের তীর্থযাত্রা তাঁর নির্দিষ্ট পথেই আরম্ভ হবে একথা বিশ্বাস করি। কত অল্প বয়সে এবং কত নিশ্চিত রূপে তিনি এপথে যাত্রা করেছিলেন উপরিউক্ত প্রবন্ধের একটি অংশ পাঠ করলেই একথা বোঝা যাবে।—

> একটা অতি পুরাতন সত্য বলিবার আবশ্যক পড়িয়াছে। সকলেই জানেন, প্রথমে যেটি একটি উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র

থাকে, মানুষ ক্রমে সে উপায়টিকে উদ্দেশ্য করিয়া তুলে। যেমন টাকা নানা সুখ পাইবার উপায় মাত্র, কিন্তু অনেকে সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়া টাকা পাইতে চান। রাগরাগিনীর উদ্দেশ্য কি ছিল? ভাব প্রকাশ করা ব্যতীত আর তো কিছু নয়। আমরা যখন কথা বাছি তখনও স্বরের উচ্চ-নীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে। কিন্তু তাহাতেও ভাবপ্রকাশ অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই স্বরের উচ্চনীচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতে উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সংগীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র···কিন্তু এখন তাহা কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এখন রাগরাগিনীই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে রাগ-রাগিনীর হস্তে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে রাগরাগিনী আজ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আজ গান শুনিলেই সকলেই দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাগ ও কানাড়া বজায় আছে কিনা; আছে মহাশয়, জয়জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কি ঋণে বদ্ধ যে, তাহার নিকটে অমনতর অন্ধ দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে? যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায়, আর তাহাতে অবর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বাহাল রাখিব না কেন।···

কোন্ কোন্ রাগিনীতে কি কি স্বর লাগে না লাগে তাহা তো মান্ধাতার আমলে স্থির হইয়া গিয়াছে, তা লইয়া অধিক পরিশ্রম করিবার কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না, এখন সংগীত-বেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ সহকারে আমাদের কি কি রাগিনীতে কি কি ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন।···মনে করুন পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যা-কাল মনে আসে ভৈরোঁতেই বা কেন প্রভাতকাল মনে

আসে? পূরবীতেই কোমল সুরের বাহুল্য, আর ভৈরোঁতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপাদন করে কেন? তাহা কি কেবল প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমত প্রভাতের রাগিনী ও সন্ধ্যার রাগিনী উভয়কেই কোমল সুরের আবশ্যক। প্রভাত যেমন ধীরে ধীরে আজ ক্রমশ নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে অতি ক্রমশ নয়ন নীমিলিত করে। অতএব কোমল সুরগুলি অর্থাৎ যে সুরের ব্যবধান অতি অল্প, যে সুরগুলি অতি ধীরে ধীরে অতি অলক্ষিত ভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর মিলাইয়া যায়, সন্ধ্যা ও প্রভাতের রাগিনীতে সেই সুরের অধিক আবশ্যক। তবে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কি বিষয়ে প্রভেদ থাকা উচিত - না, একটাতে সুরের ক্রমশ উত্তরোত্তর বিকাশ হওয়া আবশ্যক, আর একটাতে অতি ধীরে ধীরে সুরের ক্রমশ নীমিলন হওয়া আবশ্যক। ভৈরোঁতে ও পূরবীতেই সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে, এই জন্যই প্রভাত ও সন্ধ্যা উক্ত দুই রাগিনীতে মূর্তিমান।" (ভারতী, ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ)

এই উদ্ধৃতি থেকে একথাই প্রমাণ হবে যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ধ্রুপদী সংগীতের বিভিন্ন সুরের ব্যঞ্জনাকে বহুদিনের রীতিগত আচ্ছাদন থেকে মুক্ত করে বাণীর ব্যঞ্জনার সঙ্গে তার মিলন ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাই রবীন্দ্রসংগীত সুর সমৃদ্ধ হয়েও বাণীর ক্ষেত্রে গভীরতম সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।



সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে, সাহিত্যের উপজীব্য হল মানবজীবন, প্রকৃতি ও ভগবান বা অধ্যাত্ম অনুভূতি। রবীন্দ্র সাহিত্যকেও যেমন রবীন্দ্রসংগীতকেও তেমনি এই তিনটি উপজীব্য বিষয়ের ব্যাপক এবং গভীর ব্যবহার অসামান্যতা দিয়েছে।

লৌকিক সংগীতের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে সমসাময়িক ঘটনার ধারাবিবরণী থাকে। সামাজিক রীতিনীতি এবং আঞ্চলিক আচরণের মতো ব্যবহারিক জিনিষও লৌকিক সংগীতে স্থান পায়! কিন্তু সাধু সংগীতে মানবজীবন প্রধানত প্রেমসংগীত বা দেশের গৌরব সংগীতের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়

অতি অল্প বয়সে কতগুলি কাহিনীকাব্যের উপাদান হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীত রচনার হাতে-খড়ি। তৎকালে বাংলাদেশে প্রেম-

সংগীতের একটি বিশেষ রীতি প্রচলিত ছিল। প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথ সে রীতির দ্বারা কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। এসব সংগীতের পশ্চাৎপটে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল রাধাকৃষ্ণ কাহিনী। বৈষ্ণব কাব্যের পূর্বরাগ, অভিসার, মান, বিরহ ইত্যাদি রাধাকৃষ্ণ লীলার প্রতীক পরিত্যাগ করে মানবিক প্রেমের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের আখ্যায়িকা-কাব্যগুলি মূলত ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী। সংগীতগুলিও কাহিনীকে অনুসরণ করেছে।

"সখী, সে গেল কোথায় তারে ডেকে নিয়ে আয়।
দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়"

অথবা

"বনে এমন ফুল ফুটেছে
মান করে থাকা আজ কি সাজে।
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জ মাঝে"

ইত্যাদি সংগীতগুলিতে বৈষ্ণবকাব্যের স্মৃতি ( association ) স্পষ্ট। কিন্তু এই সংস্মৃতিগুলিকে রবীন্দ্রনাথ সেই অল্প বয়সেই ব্যক্তিগত আবেগের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। সেই যুক্ত করণের ফলশ্রুতি হিসেবে বৈষ্ণবকাব্যের পটভূমিতেই অত্যাশ্চর্য কয়েকটি গান রচিত হয়েছে।

"এখনো তারে চোখে দেখিনি
শুধু বাঁশি শুনেছি।
মনপ্রাণ যাহা ছিল
দিয়ে ফেলেছি।"

অন্যত্র

> "হল না, হল না, সই, হায়—
> মরমে মরমে লুকানো রহিল বলা হল না॥"

কিংবা

> "ও কেন চুরি করে যায়।
> লুকোতে গিয়ে হাসি হেসে পালায়"

প্রভৃতি গানের তৎকালীন বাংলাদেশের আসরের বৈঠকী প্রেম-সংগীতের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কিশোর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ যুগধর্মের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর সংগীতে প্রেমের লালসা বা দৈহিক আবেদন প্রথম থেকেই উপেক্ষিত হয়েছে। রসালো প্রেমসংগীতের সে যুগেই তিনি, "আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো" কিংবা "বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে" গানগুলি লিখতে পেরেছিলেন। সুরের বেদনার্ত ব্যঞ্জনায় সেগুলি যেমন অনবদ্য, বাণী প্রকাশের গভীরতায় তেমনি অনন্য। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে।

১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ভানুসিংহের পদাবলী সাধারণভাবে প্রেমসংগীতের পর্যায়ে পড়লেও এর একটি স্বকীয় মূল্য আছে। এর পরিবেশ এবং সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভাবেই বৈষ্ণব যুগের। রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর প্রেমবৈচিত্র এর অবলম্বন। কিন্তু কোনো কোনো গানে রাধার আকুতিতে মৃত্যু সম্বন্ধে কবীর জীবন দর্শনের আভাস পাওয়া যায়। সেগুলি রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর রূপের অন্তরাল ছিন্ন করে কবির ব্যক্তিগত পরমার্থিক বেদনাকে প্রকাশ করেছে।

> "বজাওরে মোহন বাঁশি"

অথবা

"মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম-সমান"

বিশেষ করে দুইটি গান শুধু রবীন্দ্র সাহিত্য নয় সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিপূর্ণতম গানের মধ্যে স্থান পাবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের উদ্দিষ্টা কোন পার্থিব প্রেমিকা নন। কৈশোর বা যৌবনের প্রেমের গানে পার্থিব প্রেমিকার অবলম্বন যদি বা কিছু থেকে থাকে, পরবর্তী কালে আদর্শীভূত হয়ে প্রকৃতির সৌরভ এবং পরমার্থিক চেতনার সঙ্গে সেটা মিশে গিয়েছে। প্রেমিকা, প্রকৃতি এবং ভগবানের সমন্বয়ে তাঁর "মানসী" প্রেয়সী গড়ে উঠেছে। প্রেয়সীর দৈহিক লাবণ্যের থেকে তাঁর মনের মাধুর্য কবির কাছে অধিক প্রিয়। সেজন্য তাঁর প্রেম-সংগীত ক্ষণে ক্ষণে পূজার উপান্তে এসে উপস্থিত হয়। তাঁর কাব্যে আছে।—

"দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা !
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"
(বৈষ্ণব কবিতা ॥ সোনার তরী ॥ আষাঢ় ১২৯৯)

রবীন্দ্রনাথের প্রেমে সুখ নেই, আনন্দ আছে। সে আনন্দ গভীর বেদনা থেকে উদ্ভূত। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে দুঃখের গভীর প্রকাশ। তাঁর মানসী প্রেয়সী তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তিতে নিজের স্পর্শ দিয়েছেন। সে অভিব্যক্তির চরম আনন্দে তিনি তাঁর চিরসঙ্গী। কিন্তু তাঁর মানসী প্রেয়সী চির-অধরা। তাঁর শাশ্বত-বিরহ কবির জীবনের সব ভাবনায় প্রতিক্ষণে

মূর্ত হয়ে আছে। উপনিষদের পরমপুরুষ যেমন একই সঙ্গে সমস্ত ভয়ের ভয়, সমস্ত আনন্দের আনন্দ, রবীন্দ্র মানসী তেমনই একই রূপের আধারে মিলনের চরম মিলন এবং বিরহের গভীরতম বিরহ।

ভগবানকে পরমপুরুষ বললে ভগবান নারী রূপেই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমিক রূপের মধ্যেও নারীত্বের আভাস ক্ষণে ক্ষণেই দেখা দেয়। এ শুধু নারীর জবানিতে প্রেমের গান রচনা নয়। তার উদাহরণও রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রচুর। কিন্তু এ হচ্ছে প্রেমবৈচিত্র্য উপলব্ধির জন্য প্রেমিক সত্তার নারীরূপ পরিগ্রহণ। আর কোনো ভাষার গানে এর জুড়ি আছে বলে জানা নেই। একটি বিশেষ গানের কথা মনে পড়ছে। এটিও সমস্ত রবীন্দ্র সংগীত সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সংগীত।

"ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ
আরো কী তোমার চাই।
ওগো ভিখারি আমার ভিখারি
চলেছ কী কাতর গান গাই॥
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
ভূষিব তোমারে সাধ ছিল মনে—
ভিখারি আমার ভিখারি,
হায় পলকে সকলি সঁপেছি চরণে
আর তো কিছুই নাই॥
আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরানু বাস।
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি
তোমার পুরাতে আশ॥
হেরো মন প্রাণ মম যৌবন নব
করপুট তলে পড়ে আছে তব—

ভিখারি আমার ভিখারি,
হায়, আরো যদি চাও মোরে কিছু দাও
ফিরে আমি দিব তাই ॥"

উদ্ধৃতি হিসেবে পুরো গানটি তুলে না দিলে প্রেম-সংগীতে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বগুলি পরিস্ফুট করা যেতনা। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এটি কোনো নাটকের স্ত্রী চরিত্রের গান নয়। কিন্তু গানটির মধ্যে নারীসুলভ আকুতি তো আছেই, উপরন্তু "আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া তোমারে পরানু বাস" কথার মধ্যে নারী দেহের ব্যঞ্জনাও আছে। প্রেমের দেওয়া-নেওয়াতে রবীন্দ্রনাথ বেহিসাবী। এক পলকেই তাঁর সমস্ত উজাড় করে দেওয়া হয়ে যায়। কিন্তু তখনও যখন প্রেমাস্পদের চাওয়া ফুরোয় না, যখন কাঙালের মতো তার অন্তর আরো চায়, সে আকুল মুহূর্তে কাঙালিনী প্রেমিকার এ আত্ম নিবেদন। "আমি আমার বুকের আঁচল ঘেয়িয়া তোমারে পরানু বাস"—এটি নির্বিচার আত্মনিবেদনের পরমা তৃপ্তির বেদনা। "আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি তোমার পুরাতে আশ"—এ শূন্যতার কান্না নয়, নিঃশেষ দানের নিরুচ্ছল গভীর আবেগ। এ দুটি পংক্তি যে কোনো বিচারে প্রেম-সংগীত সাহিত্যে শীর্ষ স্থান পেতে পারে। এই কাব্যসংগীতের সমাপ্তিও প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভঙ্গির আর একটি বিশেষত্বে সমুজ্জ্বল। প্রেমলীলায় প্রেমিকার নিঃশেষ আত্মনিবেদনে প্রেমাস্পদের তৃষ্ণা যদি না মেটে তবে প্রেমাস্পদের কাছ থেকে গ্রহণ করেই আবার তাকে নিবেদন করতে হবে। প্রেম বৈচিত্র্য উপলব্ধির এ দর্শনও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান তথা তাঁর সমগ্র প্রেম সাহিত্যকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

"হায় আরো যদি চাও মোরে কিছু দাও
ফিরে আমি দিব তাই।"

দেওয়া-নেওয়ার এই দ্বৈতলীলাই তাঁর বহু প্রেম সংগীতকে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দিয়েছে। প্রেমাস্পদকে শুধু আনন্দের ডালি সাজিয়ে নিবেদন করতে হবে তাই নয়। দুঃখবেদনার দানও প্রেমিকের গ্রহণের মধ্য দিয়ে অনন্ত সৌরভে পূর্ণ হয়।

"মম দুঃখ বেদন
মম সফল সাধন
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী সম।"

দুঃখ বেদনার দান নিবেদন করে প্রতিদানে প্রেমাস্পদের কাছ থেকে তাঁর বেদনার দান যদি প্রতিনিবেদিত হয় তবে বেদনা বিনিময়ের দ্বৈতলীলার দুঃখমন্থনের থেকে অমৃত লাভ হবে। একটি আশ্চর্য গানে এই ভাবটি রূপ পেয়েছে ;

"মম দুঃখের সাধন
যবে করিনু নিবেদন
নয়ন জলে।
শুভ লগন গেল চলে,
প্রেমের অভিষেক কেন হলনা তব নয়ন জলে।...
যদি দিতে বেদনার দান
আপনি পেতে তারে অমৃত-ফলে॥"

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান আধ্যাত্মরাজ্যের সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছে একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। উপরে যে কটি গান বা গানের অংশ উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলিকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই গীতবিতানের প্রেম অংশে যুক্ত করেছেন। যদি পূজার গানের পর্যায়ে এগুলিকে ধরা হত, তাহলেও এগুলির উপলব্ধি বা ব্যাখ্যা ব্যাহত হতনা।

কয়েকটি গানে রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে মহা-জাগতিক (Cosmic) রাজ্যে এনে উপস্থিত করেছেন। প্রেমিকা এবং প্রেমের লীলা সেখানে মহাবিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত। জাগতিক সীমার বাঁধন-হারা এই প্রেমের গানগুলির সুরের মধ্যেও এ-উদার স্পর্শ লেগেছে। এগুলির তুলনা আর কোনো সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ।

"আমার আপন গান আমার অগোচরে
আমার মন হরণ করে,
নিয়ে সে যায় ভাসায়ে সকল সীমার পারে।
ওই যে হেথায় কূলে কূলে ফাল্গুন উচ্ছ্বসিত ফুলে ফুলে
সেথা হতে আসে দুরন্ত হাওয়া লাগে আমার পালে॥"

আপনার গানের সুরে উদাস আপনাতে আবদ্ধ কবিকে তাঁর গানের সুর যতক্ষণ না ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে ততক্ষণ সুরটি কেবল তাঁর বুকের মধ্যে গুঞ্জন করছে কিন্তু গানের পালে দুরন্ত হাওয়া লাগা মাত্র সুরও উধাও হয়ে যাত্রা করেছে। গানের প্রথম কলিটিকে অবশ্য গানের উদ্দিষ্ট 'মানসী'র মূর্তি নেই। পরপারের উচ্ছ্বসিত ফাল্গুন শুধু কবিকে আহ্বান করেছে। পরবর্তী অংশে,

"কোথায় তুমি অজানা সাথী
কাটাও বিজনে বিরহ রাতি,
এসো এসো উধাও পথের যাত্রী—
তরী আমার টলোমলো ভরা জোয়ারে॥"

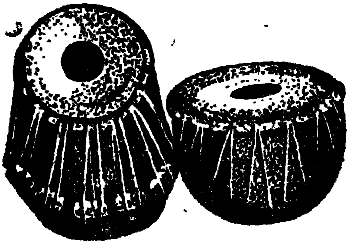
এই অংশে সুরের পালে দুরন্ত হাওয়ার টানে কবির গানের তরী নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। অজানা সাথীর অভিসার-যাত্রার সুরটি গানের মর্মার্থকে অন্তরঙ্গভাবে আলিঙ্গন করেছে। অন্য আর একটি

-ব করেছেন।"

গানে কবি সমুদ্র বা নদীর চিত্রকল্পকে অবলম্বন করেন সে-রকম গানটিতে আছে মহাকাশের চিত্র। গানের ভাব, চিত্ররূপ, বাক্ এবং সুর মিলে কবির মানস যাত্রার উদ্বেল আকাঙ্ক্ষাকে সাধারণ প্রকাশের সীমা উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। কবির বিরহ মহাজাগতিক অসীমতার পটভূমিতে মহাবিরহের অনন্ত আকুতিতে পরিণত হয়েছে।

"বাণী মোর নাহি
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি।
আমি অমাবিভাবরী আলোহারা,
মেলিয়া অগণ্য তারা
নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি॥
তুমি যবে বাজাও বাঁশি সুর আসে ভাসি
নীরবতার গভীরে বিহ্বল বায়ে
নিদ্রা সমুদ্র পারায়ে।
তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরায়ে
কে জানে সে কি পশে তব স্বপ্নের তীরে
বিপুল অন্ধকার বাহি॥"

সুরনিরপেক্ষ প্রেমের কবিতা রূপেও এটির তুলনা কোথাও চোখে পড়ে না। সুরের পাখায় এর মহাকাশ-যাত্রা স্বচ্ছন্দে হয়েছে।



সংগীতে মানবজীবন যেখানে প্রতিফলিত সে-পর্যায়ে স্বদেশ সম্বন্ধে ভাবনাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। স্বদেশের ভৌগোলিক রূপ, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রাচীন গৌরব গাথা সর্বদেশের সর্বকালের সংগীতের বিষয়বস্তু। ভারতবর্ষের আধুনিক স্বদেশী সংগীতের মধ্যে বিদেশী অধিকারের থেকে মুক্ত হবার সাধনাও যুক্ত হয়েছিল। বাংলাদেশে স্বদেশী সংগীতের বিকাশ হয়েছে ভাষা সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতে তার পূর্ণতম পরিণতি। ভারতবর্ষ এবং নূতন "বাংলাদেশ" ভারত উপমহাদেশের এই দুটি খণ্ডেরই জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথের রচিত। এই দুটি সংগীতে স্বদেশী সংগীত সাহিত্যের সূচনা এবং পরিণতি বিশেষভাবে বিধৃত হয়ে আছে। "বাংলাদেশের" জাতীয়-সংগীত, "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটিতে গ্রাম-বাংলার একটি অন্তরঙ্গ সুন্দর চিত্র আছে। দেশের সৌন্দর্যের রূপমুগ্ধ কবি তাঁর

দেশপ্রেমকে তাঁর অব্যবহিত পটভূমির মধ্যেই অনুভব করেছেন। ভারতের জাতীয়-সংগীত "জনগণমন-অধিনায়ক" গানে সে-রকম আবিষ্ট বর্ণনা নেই কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক ঐক্যের একটি গভীর উপলব্ধির পরিচয় আছে।

হিন্দুমেলার যুগেই রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তখন তাঁর কৈশোর উত্তীর্ণ হয়নি। সে-যুগে দেশের দৈন্য দুর্দশা মোচন করে তাকে পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্পই স্বাদেশিকতার মূল মন্ত্র ছিল। কিন্তু অতি অল্প বয়সেই যখন রবীন্দ্রনাথ

"তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।"

লিখেছিলেন তখনই এক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছিল। স্বদেশীযুগে বঙ্গভঙ্গের আমলে অখণ্ড বাংলাদেশের চিত্রই তাঁর স্বদেশী সংগীতকে বিশেষ করে অধিকার করেছিল। সে-যুগে সুর-প্রয়োগে তিনি দেশী লৌকিক সংগীতের উপরই বেশি নির্ভর করেছিলেন কারণ সে সুরগুলি অতি সহজেই সাধারণ মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছয়।

ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষের একটি অখণ্ড রূপ তাঁর স্বদেশী-সংগীতকে বিশেষভাবে অধিকার করেছিল। বিদেশী শাসককে ধিক্কার দেবার প্রচেষ্টা থেকে দেশকে স্বকীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্পই সেখানে প্রধান। এ গানগুলিতে গভীরতা কিন্তু সাময়িক; উচ্ছল আবেগ নেই। দেশের জনগণকে তার অব্যবহিত দুঃখ কষ্ট থেকে আকস্মিক মুক্তি দেবার সংকল্প থেকে তাদের বৃহত্তর মানবতার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প সেখানে প্রধান। পরাধীনতা থেকে মুক্তি বৃহত্তর মানবতার স্বীকৃতির একটি সোপান। কিন্তু

মানুষের চিরন্তন অপমান থেকে মুক্তি আরও দূরবর্তী লক্ষ্য। সে লক্ষ্যের দিকেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-সংগীত প্রসারিত। সেজন্য স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও প্রাপ্তিকে অতিক্রম করেও তাঁর স্বদেশী-সংগীত-গুলির প্রাসঙ্গিকতা অবলুপ্ত হয়নি। ক্ষণিক সমসাময়িকতার ঊর্ধ্বে সেগুলির সাহিত্যিক মর্যাদা বহুকাল আমাদের মনকে অধিকার করে থাকবে।

ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চল এবং অধিবাসীদের, ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের উপযুক্ত করে তিনি যখন স্বদেশী-সংগীত রচনা করেছিলেন তখন সেগুলিতে আরও একটি সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্যও তিনি যুক্ত করেছিলেন। বাংলাভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ-স্বরের উচ্চারণ নিয়মিত নয়। দীর্ঘ স্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ এবং কোনো সময় হ্রস্ব স্বরকে টেনে দীর্ঘ করার রীতি আধুনিক বাংলায় প্রচলিত। কিন্তু সর্ব-ভারতীয় রীতিতে এটি গৃহীত নয়। তাই সংস্কৃত অনুসারী হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের রীতিকে তিনি সর্বভারতীয় স্বদেশী সংগীত রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

> "অয়ি, ভুবন মনোমোহিনী, মা,
> অয়ি নির্মল সূর্য করোজ্জল ধরণী জনক জননি জননী॥
> নীল সিন্ধু জল ধৌতচরণ তল অনিল বিকম্পিত
> শ্যামল অঞ্চল,
> অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল শুভ্র তুষার কিরীটিনী॥"

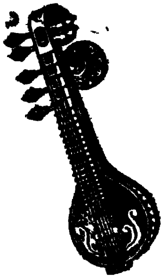
কিংবা

> "মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গণ কর মহোজ্জ্বল আজ হে
> বর-পুত্র সংঘ বিরাজ' হে।"

ইত্যাদি সংগীতগুলি তার উদাহরণ। 'জনগণ-মন' গানটিও তাই।

আরও একটি ভাষাগত বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথের এই বিদেশী সংগীত-গুলিকে সর্বভারতীয় রূপ দিয়েছে। সেটা হল ক্রিয়াপদের সামান্যতম ব্যবহার। সাধারণত ক্রিয়াপদগুলি এবং উচ্চারণের বিভিন্নতাই ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলের ভাষার বিভিন্নতা নিরূপণ করে। সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার, সংস্কৃত রীতির উচ্চারণ এবং ক্রিয়াপদের বিরলতা রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশী সংগীতগুলিকে সব অঞ্চলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। বাণীকে হ্রস্বদীর্ঘ বর্ণের বিভিন্নতা না মেনে সুরের সাহায্যে সংগীতের মধ্যে হ্রস্বদীর্ঘতা আনা যেত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে শুধু সুর নির্ভর সংগীতরূপে রচনা করেন নি; পাঠযোগ্য সাহিত্য হিসেবেও তাদের অনুরূপ মর্যাদা চেয়েছিলেন সেটা পরিস্কার বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের আত্মা নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। নানা বিভেদের মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্যের সন্ধান ভারতবর্ষের ধর্ম। সকল সম্প্রদায় এমনকি বহির্ভারতীয় সম্প্রদায়কে স্বীকার করে নেওয়াই ভারতের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত এই আদর্শকেই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে। স্বদেশের গৌরবগাথার সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীকে স্বদেশের তীর্থক্ষেত্রে আহ্বান রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতকে মহীয়ান করেছে। "দূর হটো দুনিয়া-ওয়ালে" নয় "এসো হে আর্য এসো অনার্য হিন্দু মুসলমান" এই তার বাণী। ভারতবর্ষ কেবলমাত্র ভৌগোলিক ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষ "মহামানবের সাগরতীর"।



আধ্যাত্মিক সংগীত বা ভগবৎ ভক্তির সংগীতেও রবীন্দ্রনাথ অনন্য-সাধারণ সাহিত্য রচনা করেছেন। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক মর্মবাণী, ধর্ম ও সংশ্লিষ্ট আবরণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের উদারতা, আধুনিক ভারতবর্ষের ধর্ম চিন্তায় পাশ্চাত্যের অনুপ্রবেশ ইত্যাদি সব ঘটনার সাংগীতিক এবং সাহিত্যিক বিশ্লেষণ তাঁর ধর্মসংগীতের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায়। এটা অবশ্য এই সংগীতগুলির বাহ্য রূপ। একান্ত ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে এগুলির সাহিত্যিক গভীরতা ও বিস্তার এবং সুর প্রয়োগে এগুলির অনন্য সাধারণতা রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সংগীতকে রসলোকে উত্তীর্ণ করেছে।

ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যাতা হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ ধর্ম-সংগীতের রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। এই সংগীতগুলির তৎকাল প্রচলিত নাম ছিল ব্রহ্ম-সংগীত। ব্রাহ্মধর্ম নব জাগ্রত ভারতবর্ষে যে উদার মতের

প্লাবন এনে দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য সহযোগীদের সঙ্গে তারই ভাষা দেবার প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রথম যুগের এ সংগীতগুলি সাধারণত ধ্রুপদী (classical) সুরকে অবলম্বন করেছে। এগুলি শান্ত রসেরই কাব্য। ভগবানের অপার মহিমা উপলব্ধি এবং তার বিরাটত্বের কাছে নিজের সসীমত্বের বেদনাবোধই মোটামুটিভাবে সেগুলির উপজীব্য। কোনো কোনোটি উপনিষদের কোনো মন্ত্রের মর্মার্থের অনুবাদ। সাধারণ পরিকল্পটি প্রধানত হিন্দুধর্ম ও দর্শনের।

কিন্তু সাধারণ পরিবেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই উত্তীর্ণ হয়ে নিজস্ব অন্তরতম আকুতির পরিচয় দিয়েছেন। এই পরিচয়ই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সংগীতকে "ব্রহ্মসংগীত" আখ্যা থেকে "পূজার গান"-এ পরিণত করেছে।

ধ্রুপদী সুরের একাধিপত্য বর্জন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্ম সংগীতেও দেশী সুরের সংযোগ করেছিলেন। বাউল এবং বিশেষভাবে কীর্তনের সুর তাঁর ধর্মসংগীতকে বিশেষভাবে আশ্রয় করেছে। শুধু সুরই নয় বাউল এবং বৈষ্ণব দর্শনও বহুল পরিমাণে তাঁর ধর্ম সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদেশে যে উপাসনা মন্দির স্থাপিত হয়েছিল সে মন্দিরের উপাসনায় এমন মন্ত্র পাঠ করার নির্দেশ ছিল যাতে পৃথিবীর যে কোনো ধর্মের লোকেরই তাতে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীত পরবর্তীকালে সে আদর্শকেই অনুসরণ করেছে। "গীতাঞ্জলি"র প্রথম গানটির কথা এ-প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে।

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধুলার তলে।"

এ সংগীতের উদ্দিষ্ট ভগবান বিশেষ করে হিন্দুর বা বৌদ্ধের বা খ্রীষ্টান বা মুসলমান বা অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ের নন। এ দেবতাকে যে কোনো ভক্ত একান্ত নিজস্ব দেবতা বলে প্রণাম করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভগবান বা জীবন দেবতাকেও বিশ্ব প্রকৃতি এবং প্রেমিকার মধ্য দিয়েও উপলব্ধি করেছেন। তাঁর এই দ্বৈত লীলায় বৈষ্ণব কবিদের অনুরূপ প্রেম-বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়েছে। যে সত্তা প্রেমিকার প্রেমের অনন্ত মাধুর্যে ধরা দিয়েছেন, সে সত্তাকেই তিনি বিশ্ব প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন। সেই একই সত্তা কাবর জীবনের বিকাশের পর্বে পর্বে আত্মপ্রকাশ করে চলেছেন। প্রথম জীবনে এই সত্তার কোনো বিশেষ মানসিক মূর্তি ছিল না। কিন্তু জীবনের শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকৃতি-প্রেম ও পূজার প্রেরণায় নটরাজের একটি মানস মূর্তি কল্পনা করেছেন। একটি সংগীতে বলেছেন,

"নৃত্যের তালে তালে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥
তোমার চরণ পরন পরশে সরস্বতীর মানস সরসে
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
ঢেউ তুলে দাও, মাতিয়ে জাগাও অমল কমল গন্ধ হে॥
নমো নামো নমো—
তোমার চিত্ত অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥"

রূপলোকের এবং মানসলোকের অধিদেবতা রূপে নটরাজের এই প্রতীকটিকে তিনি ভারতবর্ষের চির অভ্যস্থ পুজার গণ্ডী থেকে উদ্ধার করে বিশ্বজগতের রূপানুবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেছিলেন; "নটরাজ" গীতিনাট্যের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরা-
কাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য
পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে
থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে
যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস
উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।"

ধর্মসংগীত বা পূজার গানে রবীন্দ্রনাথের ক্রমবিকাশ সাহিত্য-সন্ধানীদের কৌতুহলের বস্তু। প্রথম জীবনে ধর্মের নানা প্রেরণাকে সাহিত্য এবং সংগীতে রূপ দিয়ে "গীতাঞ্জলি"র গীতিকাব্যের যুগে এসে রবীন্দ্রনাথ একটি ধারাবাহিকতাকে নিবিড়ভাবে অবলম্বন করেছেন। "গীতাঞ্জলী" "গীতিমাল্য" এবং গীতালী এই ত্রয়ীর প্রথমটি অভিসারের কাব্য বা সংগীত, দ্বিতীয়টি মিলনের এবং সবশেষটি ভাব সম্মিলনের। বৈষ্ণব পরিভাষার ভাব সম্মিলন তাঁর পরবর্তী জীবনের পূজার গানকে অধিকার করে আছে।

"জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবস-রাত
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে স্মরিব জীবন-নাথ॥
যেদিন তোমার জগত নিরখি হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি
সেদিন আমার নয়নে হয়েছে তোমার নয়ন পাত
বারে বারে তুমি আপনার হাতে স্বাদে সৌরভে গানে
বাহির হইতে পরশ করেছ অন্তর মাঝখানে।"

এই অত্যাশ্চর্য সংগীতটির প্রেরণাই তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর কোনো অনুভূতিকে পুরনো হতে দেয়নি। তাই তাঁর পূজার শেষ নিবেদন

"পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।

যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।"

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং সংগীতে "মৃত্যুর" প্রতি একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি অনুস্যূত হয়ে আছে। যিনি অনন্ত মহাজীবনে বিশ্বাসী পৃথিবীর সুখ দুঃখকে তিনি চরম প্রাপ্তি বলে মনে করেন না। "মৃত্যুও" তাঁর কাছে সে মহাজীবনের পথে একটি তোরণ মাত্র। জীবনের ব্যথা বেদনা সুখ, দুঃখ, এমন কি মৃত্যু লীলায় আনন্দময় সত্তার দিকে মানুষের যাত্রা।

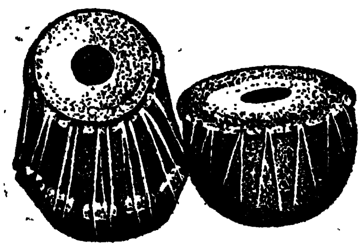
"লুকিয়ে আস আঁধার রাতে, তুমি আমার বন্ধু!
লও যে টেনে কঠিন হাতে, তুমি আমার আনন্দ॥
দুঃখ-রথের তুমিই রথী, তুমি আমার বন্ধু।
তুমি সংকট তুমি ক্ষতি, তুমিই আমার আনন্দ॥
শত্রু আমারে করগো জয়, তুমিই আমার বন্ধু।
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়, তুমি আমার আনন্দ॥
বজ্র এসো হে বক্ষ চিরে, তুমিই আমার বন্ধু।
মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে, তুমি আমার আনন্দ॥"

এই তাত্ত্বিক অনুভূতিও রবীন্দ্রনাথের পূজার গানকে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছে। এখানে ভগবানকে "সুখ দুঃখের চরম" আনন্দরূপেই দেখেছেন। এখানে বিশ্ব জাগতিক পটভূমি নেই, শুধু নিবিষ্ট অন্তরের মন্ত্রগুঞ্জনে পূজার গান নিবেদিত। কিন্তু বিশ্বজাগতিক পটভূমিও বহু পূজার গানকে পরিব্যাপ্ত করে আছে।

"জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে,
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে॥
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,

গভীর কি আশায় নিবিড় পুলকে
তাহার পানে চাই দুবাহু বাড়ায়ে॥
নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে
আঁধার কেশ পাশ দিয়েছে বিছায়ে।
ত্যাজি এ কোন গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া।
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে
গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে।

মহাজাগতিক ব্যঞ্জনায় এ সংগীতের কথা ও সুর রবীন্দ্রনাথের পূজার গানকে অনন্ত অর্থমণ্ডিত করেছে।



রবীন্দ্রনাথ মূলত প্রকৃতির কবি। তাঁর কাব্য এবং সংগীতে তাই প্রকৃতিই প্রধান অংশ জুড়ে আছে। প্রেমের গান ও সাহিত্যে তিনি তাঁর প্রেয়সীকে প্রকৃতির লাবণ্যের সঙ্গে সমন্বিত করে অনুভব করেছেন, তাঁর ভগবান বা জীবন দেবতার উপলব্ধিও মুখ্যত প্রকৃতিকে অবলম্বন করেই প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর মানসী প্রেয়সীকে যত নিবিড় সন্নিধানের তিনি পেয়ে থাকুন তাঁর সঙ্গে কবির ব্যবধান তবুও ঘোচেনি। ভগবান সংস্পর্শ তাঁর যতই গভীর হয়ে থাকুক, তাঁর চরণ প্রান্তে তিনি "অলি"র মতো গুঞ্জন করেছেন, নিজের সম্পূর্ণ সত্তা বিসর্জন দিয়ে তাঁর চরণে লীন হয়ে যাননি। প্রেয়সী এবং ভগবানের সঙ্গে লীলা বৈচিত্র্যে তিনি দ্বৈতবাদী। কিন্তু প্রকৃতির দেহনির্যাসে তিনি নিজের সত্তাকে মিলিয়ে দেবার প্রয়াসী। প্রকৃতি প্রেম তাঁর অদ্বৈত সিদ্ধি।

তিনি মনে করতে পারেন একদিন তিনি প্রকৃতির মধ্যে নিলীন থেকে সমস্ত বিশ্ব সৌন্দর্যকে নিমেষে নিমেষে আস্বাদন করেছেন,

"তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন।
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরু রাজি
পত্র ফুল ফল গন্ধরেণু।"      ( সোনার তরী, বসুন্ধরা )

অন্যত্র আছে, "এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়েছিলুম, যখন আমার সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর দূরান্তর দেশ দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম······"

রবীন্দ্রসংগীতের "প্রকৃতি" পর্যায়ে এই একাত্মতা ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বেদনা বা আনন্দের সন্ধান, বা নিজের আনন্দে বেদনায় প্রকৃতিকে অনুরঞ্জিত করা কবি সাধারণের ধর্ম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি আনন্দ বেদনার শুধু প্রেরণা নন, তিনি কবিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কবিসত্তা প্রকৃতিসত্তার মধ্যেই নিমগ্ন। বর্ষায় নবতৃণদল বা ঘন বন ছায়াকে দেখে কবি হঠাৎ ফুল্ল হন তাই নয়, তাঁর নিজের আনন্দ নবতৃণদলে আর ঘন বন ছায়ে বিছানো থাকে। শ্রাবণের বিষন্ন সন্ধ্যায় মেঘ নিবিক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর মন ভারী হয়ে ওঠে বা কোনো

একটি ক্রন্দনসিক্ত ছলছল আঁখির কথাই যে শুধু তাঁর মনে পড়ে তাই নয়, তাঁর গানের বাণী বলে,

"আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি
মম জল-ছলোছলো আঁখি মেঘে মেঘে।
বিরহ-দিগন্ত পারায়ে অনিমেষে আজি জেগে।"

শ্রাবণ রাত্রির অবিশ্রাম বর্ষণে আকাশের ক্রন্দন তাঁর মনকে শুধু আচ্ছন্ন করে তাই নয়, তিনি আকাশের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়ে গান গেয়ে ওঠেন,

"আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে,
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।"

তারাখচিত নির্মেঘ রাত্রিতে শুধু আকাশেই তারারা শোভা পায় না, কবির বাণী,

"আজি যত তারা তব আকাশে,
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে॥"

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির এই একাত্মতা তিনি গানের মধ্য দিয়েই লাভ করেছেন। কয়েকটি অত্যাশ্চর্য গানে পূজার আর্তি প্রকাশিত হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্নতার পথ ধরে,

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন খানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি॥
তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরমবাণী।
তখন সে যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারি ঘাসে ঘাসে।"

ঘাসের কম্পন নিজের হৃদয়ের কম্পনের সঙ্গে একাত্ম করে বিশ্ব-প্রকৃতিকে কবি উপলব্ধি করেছেন। অন্য একটি গানে আছে—

"যে-ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবন গানে॥
গগনে তব বিমল নীল-হৃদয়ে লব তাহারি মিল,
শান্তিময়ী গভীরবাণী নীরব প্রাণে॥...
ফুলের মতো সহজ সুরে প্রভাত মম উঠিবে পুরে,
সন্ধ্যা মম সে-সুরে যেন মরিতে জানে।"

অন্য একটি গানে আছে,

"বাঁধলে যে সুর তারায় তারায় অন্তবিহীন অগ্নিধারায়
সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে তোমার ব্যাকুলতা।"

এ গানগুলিতে প্রাকৃতিক উপাদানগুলি নিজের মধ্যে আহরণ করে কবি নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে দ্বৈত লীলায় কবি শুধু গ্রহণও করেন নি, দানও করেছেন। কবির কাব্যে আছে,

"আমার আনন্দ লয়ে
হবে নাকি শ্যামলতর অরণ্য তোমার?
প্রভাত আলোক মাঝে হবেনা সঞ্চার
নবীন কিরণ কম্পা?
(সোনারতরী, বসুন্ধরা)

অন্যত্র

নবীন আষাঢ়ে রবি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্ত কায়া
বাসন্তী বাস-পরা।

ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে অরণ্য-ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব ॥"
( সোনার তরী, পুরস্কার )

আপনার মনের মাধুরী দিয়ে প্রকৃতিকে মাধুর্যময়ী করে তোলার এই মনোরথে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একক। রবীন্দ্রসংগীতেও প্রকৃতির মধ্যে নিজের আশা আনন্দ বা দুঃখ-বেদনাকে সঞ্চারিত করে দিয়ে তাকে উপলব্ধি করার অগণিত উদাহরণ আছে।

'আমি শ্রাবণ আকাশে ওই দিয়েছি পাড়ি
মম জল ছলোছলো আঁখি মেঘে মেঘে।"

অথবা

"আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের জলে,
তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণ গগন তলে।"

কিংবা

"শরত-আলোর কমল বনে
বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে"।

অন্যত্র

"আমার বনে বনে ধরল মুকুল
বহে মনে মনে দক্ষিণ হাওয়া।
মৌমাছিদের ডানায় ডানায়
যেন উড়ে মোর উৎসুক চাওয়া ॥
গোপন স্বপন কুসুমে কে এমন সুগভীর রঙ দিল এঁকে
নব কিশলয় শিহরণে ভাবনা আমার হল ছাওয়া ॥"

দেওয়া নেওয়ার এই দ্বৈত লীলায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বিষয়ক সংগীতে একটি নূতনতর অর্থ যুক্ত হয়েছে।

প্রকৃতি বর্ণনায় কবিরা অনেক সময় তাঁর চিত্ররূপের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। প্রকৃতি তার সমস্ত দৃশ্য-সম্ভার নিয়ে কবিকে বিমুগ্ধ করতে থাকেন। কখনো আঁবার তার দৃশ্য-সম্ভার তাঁকে তেমন করে আকর্ষণ করে না। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ধ্বনি বা সংগীত কবিকে উদাস করে দেয়। রবীন্দ্রসংগীতে প্রকৃতির এই চিত্ররূপ এবং ধ্বনি-রূপ উভয়ই পরিপূর্ণ সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ষা এবং বসন্তের গান থেকে দুটি দুটি করে উদাহরণ দিলেই একথা স্পষ্ট হবে। এই গানটিতে বর্ষা তার চিত্ররূপে সঞ্চারিত।

"বাদল বাউল বাজায় রে একতারা—
সারা বেলা ধরে ঝরো ঝরো ঝরো ধারা।
জামের বনে ধানের ক্ষেতে আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা॥
ঘন ঘটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর মধুর নূপুর বাজে।
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পুবে হাওয়া গৃহহারা॥"

অন্য নানা গানে বর্ষা বর্ণনার উপাদান ছাড়াই বর্ষার সংগীতটি কবি ধ্বনিত করে তুলতে পারেন।

"অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে—
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা॥"

এই গানে বর্ষা বর্ণনার প্রয়াস নেই, শুধু বর্ষার বেদনা কথায় এবং সুরে অনুরণিত হয়ে উঠেছে। বসন্তের চিত্ররূপ নিচের এই গানটিতে উচ্ছলিত।

"বকুল গন্ধে বন্যা এল দখিন হাওয়ার স্রোতে।
পুষ্পধনু, ভাসাও তরী নন্দন তীর হতে॥
পলাশ কলি দিকে দিকে তোমার আখর দিল লিখে,
চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল অরণ্য পর্বতে॥
আকাশ-পারে পেতে আছে একলা আসন খানি—
নিত্যকালের সেই বিরহীর জাগল আশার বাণী।
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে নবীন প্রাণের পত্র আসে,
পলাশ জবায় কনক-চাঁপায় অশোকে অশ্বথে॥"

বসন্তের ধ্বনি-রূপের সংগীত এই গানটিতে গভীরতায় মুখরিত হয়ে উঠেছে—

"বেদনা কি ভাষায় রে
মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে।
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা॥
দিবা নিশা আছি নিদ্রাহরা বিরহে
তব নন্দনবন-অঙ্গণ দ্বারে,
মনোমোহন বন্ধু—
আকুল প্রাণে
পারিজাতমালা সুগন্ধ হানে॥"

একটি কথা অবশ্য বলা প্রয়োজন সাহিত্য বিচারে এই ধ্বনি এবং বসন্তের সংগীতের প্রথমটিতে চিত্ররূপের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে ধ্বনি রূপের, কিন্তু গানের সুর সংযোগে চিত্ররূপ এবং সংগীতরূপ সমন্বিত হয়ে আছে। এই সমন্বয়ের সাফল্যই রবীন্দ্র-সংগীতকে অপরূপ মাধুর্যমণ্ডিত করেছে।

রোমান্টিক কবিদের একটি বিশেষত্ব হল এই যে উপলব্ধির গভীরতায় অনেক সময় তাদের ইন্দ্রিয়ের ভেদ রেখা বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেটা চোখে দেখার জিনিষ সেটা হয়তো শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়। আবার সুগন্ধি পুষ্পকে তাঁরা স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেন। চণ্ডীদাসের একটি কবিতায় বিরহে ক্ষীণ রাধিকার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে কবি বলেছেন,

"শুনি কি না শুনি কহে সরু বাণী
যেন অরুন্ধতী তারা।"

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-সাহিত্যে অনুভবের ইন্দ্রিয়ের এই ভেদ রেখার বিলুপ্ত ক্ষণে ক্ষণেই লক্ষ্য করা যায়।

"ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো জড়ায়ে ধরিছে গলে।"

কিংবা

"সুরগুলি তার নানা ভাগে রেখে যাব পুষ্পরাগে,
মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় করব বিলীন।"

অথবা

"মোর সংগীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়েছি জড়ায়ে
তুমি আমারি তুমি আমারি॥"

অনেক সংগীতে বাণীতে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও ব্যঞ্জনায়—হয় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মিলন ঘটেছে, না হয় এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের বিলাপরূপে অনুভূত হয়েছে। উদাহরণ সারা সংগীত সাহিত্যে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

রোমাণ্টিক কবিদের আর একটি বিশেষত্ব হল অনুভূতির গভীরতা অনেক সময় তাঁদের অব্যবহিত পটভূমিকাতে বিশিষ্ট হয়ে থাকতে দেয় না। তাঁদের আশে পাশের দেখা জগত তার অপূর্ণতা এবং খণ্ডতা নিয়ে কবিকে কেবলি ব্যথিত করতে থাকে। তখন তাঁরা পরিদৃশ্যমান এই জগত থেকে অন্য একটি কল্প লোকের জগতে অভিসার করেন। রবীন্দ্রনাথের সংগঠিত সাহিত্যে তথা কাব্য সাহিত্যে এই অভিসার ঘটেছে অতীতের কাব্যে ধৃত দুটি জগতে। একটি বৈষ্ণব কবিতার জগতে, অন্যটি কালিদাসের সমগ্র কাব্যের, তবু বিশেষ করে মেঘদূতের জগত।

রাধাকৃষ্ণ কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ নিখিলের প্রেমিক প্রেমিকার প্রতীক কাহিনীরূপে কল্পনা করে বৈষ্ণব কবির সৃষ্ট জগতের সব সাংস্কৃতি-গুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। "ভানুসিংহের পদাবলী"তে-সচেতন ভাবেই রাধাকৃষ্ণ কাহিনীকে কবি সংগীতের অবলম্বন করেছেন। কিন্তু অন্য বহু গানে কাহিনী অংশের ব্যঞ্জনা আছে, স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

"এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি ॥
শুনেছি মুরতি কালো, তারে না দেখাই ভালো
সখী বলো, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি ॥"

কিংবা

মরি লো মরি, আমার বাঁশিকে ডেকেছে কে ॥
ভেবেছিলাম ঘরে রব, কোথাও যাবনা—
ওই যে বাহিরে বাজিল বাঁশি, বলো কী করি ॥
শুনেছি কোন কুঞ্জবনে যমুনা তীরে
সাঁঝের বেলায় বাজে বাঁশি ধীর সমীরে—
ওগো তোরা জানিস যদি পথ বলে দে ॥"

বৈষ্ণব কাব্যও মূলত সংগীত। বৈষ্ণব সংগীতের সুর কীর্তনকে রবীন্দ্রনাথ নূতনতর সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। শুধু পূজার গানে নয়, স্বদেশী সংগীত এবং সকলপ্রকার প্রেমের গানে এই সুর প্রযুক্ত হয়েছে। বৈষ্ণব কবিতার সংস্মৃতি এবং সুর মিলে তাঁর রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার জগতে যাত্রাকে অভিনব অর্থমণ্ডিত করেছে।

বৈষ্ণব কবিতার জগতের মতো কালিদাসের কাব্যের জগতও তাঁর সংগীতের অন্যতম অবলম্বন। "বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো আমার মনে" গানটিতে মেঘদূতের যাত্রাপথের সংস্কৃতি কয়েকটি উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত হয়েছে ;

"সেদিন এমনি মেঘের ঘটা, রেবা নদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈলশিরে
মালবিকা অনিমিখে      চেয়েছিল পথের দিকে
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে ॥"

অন্য একটি গানে আছে,

"সেথায় বিজন সাগর কূলে
শ্রাবণ ঘনায় শৈলমূলে
রাজার পুরে তমাল গাছে      নূপুর শুনে ময়ূর নাচেরে
সুদূর তেপান্তরের শেষে ॥"

এখানেও কালিদাসের কাব্যের সুদূর সংস্মৃতি আছে। "ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে" কাব্য সংগীতে কালিদাসের কাব্যের পটভূমি অবাধে ব্যবহৃত হয়েছে কারণ কালিদাসের কালে জন্ম নেবার সাধ কবির অন্যতম সাধ। আর একটি গানে কালিদাসের কাল সংগীতের ধ্বনিতে এবং নৃত্যছন্দে মুখরিত হয়ে উঠেছে।

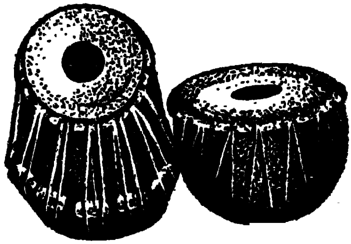
"এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে,
এসো করো স্নান নবধারা জলে ॥

দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ—
কাজল নয়নে, যূথী মালা গলে।"

রবীন্দ্রসংগীতের সাহিত্য-কৃতি নানারূপে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতি প্রেম এবং পূজার সম্মিলনে তাঁর সংগীত-সাহিত্য অনন্য। কোনো কোনো সংগীতে একই আধারে এই তিনটি পর্যায়ের বিশেষত্বগুলি এমন অন্তরঙ্গ ভাবে সমন্বিত হয়েছে যে এগুলি প্রেমের বেদনায় চরমতম পূজার নিঃশেষ আত্মনিবেদনের গভীরতম এবং প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের নিবিড়তম রূপ পরিগ্রহ করেছে। একটি উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধে উপসংহার করছি। গানটি "ফাল্গুনী" গীতি-নাট্যের। পটভূমি বসন্তের। গানটি পূজার কিন্তু ব্যঞ্জনা প্রেমের।

"ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে
চলো তোমার বিজন মন্দিরে॥
জানিনে পথ, নাই যে আলো, ভিতর বাহির
কালোয় কালো॥
তোমার চরণ শব্দ বরণ করেছি
আজ এই অরণ্য গভীরে॥
ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে
চলো অন্ধকারের তীরে তীরে
চলব আমি নিশীথ রাতে তোমার হাওয়ার ইসারাতে,
তোমার বসনগন্ধ বরণ করেছি
আজ এই বসন্তসমীরে॥"

যাঁর কণ্ঠে এই গানটি উপস্থাপিত করা হয়েছে "ফাল্গুনী" নাটকের সেই অন্ধ-বাউলের মতো কবির সংগীত-সাহিত্যের ধ্বনির ইসারা এবং সাহিত্য সৌরভের পথ ধরে যদি কবির বিজন মন্দিরের পথ আমরা খুঁজে পাই তবে আমাদের অন্তর মহাতৃপ্তির আস্বাদনে ধন্য হবে।



রবীন্দ্রনাথ একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, আমাদের শিক্ষায়তন-গুলিতে আমরা ছাত্রদের কাছ থেকে বিশ্বজগতকে হরণ করে তাদের ভূগোল শিখাই, মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে তাদের ব্যাকরণ শিখাই। তাদের তৃষ্ণা মহাকাব্যের কিন্তু তাদের আমরা সাল তারিখ সমন্বিত ঘটনাপঞ্জী দিয়ে তৃপ্ত করতে চাই। শিশু যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে সেটা প্রাণবন্যায় উদ্বেল, কিন্তু আমরা তাদের একটি জীবন্ত গ্রামোফোনের রাজ্যে নির্বাসিত করে দিই।

তাঁর এ আক্ষেপ নিছক কবিজনোচিত অবাস্তব আক্ষেপ নয়। শিশু বয়সে বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা থেকে এ আক্ষেপ তাঁর মনে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। চার দেয়ালে ঘেরা একটি খাঁচার মতো স্কুল-ঘরে তিনি যেদিন নির্বাসিত হয়েছিলেন, সেদিন হঠাৎ তাঁর অতি-সচেতন মন বিতৃষ্ণায় ভরে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন, আমার এই বিপুল

বিশ্বজগতের মধ্যে জন্ম হয়েছিল, স্কুল ইনস্পেক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করে জন্ম হয়নি। কিন্তু জগতের সব মাধুর্য-বিরহিত ছোটো ঘরটিতে কেন আমাকে ঠেলে পাঠানো হয়েছিল আমি জানি না। শুধু ঘর নয়, শিক্ষার রীতিকেও তাঁর অনুষ্ঠানসর্বস্ব মনে হয়েছিল। তার যত আড়ম্বর, কার্যকারিতা ততটা নয়। "তোতাকাহিনী" নামক ছোটো গল্পে অনুষ্ঠান-পীড়িত এই শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপে তিরস্কৃত করেছেন। শিক্ষার্থীদের খাঁচায় পোরা তোতাপাখির সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, "শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কি কপাল।" বিদ্যালয়ের শিক্ষার যে আয়োজন সেটা শিশুর প্রয়োজনের প্রতি নজর রেখে তৈরী হয় না।

আয়োজনের সমারোহকেই আমরা সর্বস্ব বিবেচনা করে, আয়োজনের উদ্দেশ্যকে ভুলে যাই। "তোতাকাহিনী"তে এই আয়োজন-মুখরিত শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ অনুকরণীয় ভঙ্গিতে ধিকৃত করেছে। "শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্রমিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া, তুরী, ভেরী, দামামা, কাঁশি, বাঁশি, কাঁশর, খোল, করতাল, মৃদঙ্গ, জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি, মজুর, স্যাকরা, লিপিকর, তদারকনবিশ আর মামাতো, পিসতুতো, খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলল।

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ কাণ্ডটা দেখিতেছেন।' মহারাজ বলিলেন, 'আশ্চর্য! শব্দ কম নয়।' ভাগিনা বলিল, শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।' রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই

হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, 'মহারাজ পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি।'

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, 'ঐ যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।'

অনুষ্ঠানের বাহুল্যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শিশুকে আমরা এমনি করেই ভুলে যাই। 'অর্থ কথাটির উপর শ্লেষও লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথ তাই শান্তিনিকেতনে এমন একটি শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করতে চেয়েছিলেন যেখানে শিশু এভাবে অবহেলিত হবে না। তিনি বলেছিলেন, শান্তিনিকেতনে আমি এমন একটি পরিবেশ রচনা করতে চাই যাতে শিশুদের মনে হবে শান্তিনিকেতনে আসা যেন তাদের গৃহে ফেরা। বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে তাঁর নির্বাসনের কথা মনে করেই শিশুদের জন্য এই গৃহটি তিনি নির্মাণ করেছিলেন।

তাঁর শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হল শিশুর মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তার জাগরণ এবং উন্মেষ। শিশুমনকে তথ্য-ভারাক্রান্ত করা শিক্ষা নয়। তার মনোবিকাশকে সাহায্য করাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। বিকশিত মন তার পরিপার্শ্ব থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য আপনি আয়ত্ত করে নেবে। মনোবিকাশ সফল হয় আত্মপ্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থার সাহায্যে।

মানব শিশুর আত্মপ্রকাশের তিনটি বাহন। একটি তার ভাষা, একটি সুর ও ছন্দ। তৃতীয়টি রেখা ও রঙ। প্রথম বাহন ভাষা অনেক পরে মানুষের অধিগম্য হয়েছে। যতদিন তার মুখে ভাষা আসেনি ততদিন সে ছন্দে সুরে বা রেখার রঙে আত্মপ্রকাশ করেছে।

একদিন মুখের ভাষা সে আবিষ্কার করেছে, তারপর কলমের আঁচড়ে মুখের ভাষাকে ধরে রাখার পদ্ধতিও তার আয়ত্তে এসেছে। তখন থেকে ভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের আত্ম প্রকাশের সে প্রায় একক বাহন হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার্থীর মনোবিকাশের সময় আত্মপ্রকাশের তিনটি বাহনকেই উপযুক্ত মর্যাদায় তার সামনে ধরে দিতে হবে। ভাষা, সংগীত এবং চারুকলা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ব্যবস্থার তিনটি প্রধান অঙ্গ। যদি এর মধ্যে কোনোটি কোনো কারণে ব্যাহত হয় তবে শিক্ষার্থীর মনে কোনো না কোনো খর্বতা চিরস্থায়ী হবে। সেজন্য শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনটি বাহনের গুরুত্বই সমভাবে স্বীকার করা হয়েছে। এটা সংগীত ভবন বা কলাভবনে বিশেষ বিষয় নিয়ে সংগীত বা কলার সাধনা নয়। এটা শিক্ষার পদ্ধতির মধ্যে গোড়া থেকেই ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সংগীত বা কলাবিদ্যাকে গেঁথে দেওয়া। শিক্ষার্থী কোন্ সময়ে কোন্ বাহনটিকে তার আত্মপ্রকাশের আয়ুধরূপে বেছে নেবে সেটা পূর্বাহ্ণে বলা কঠিন। কিন্তু সহানুভূতিশীল শিক্ষক যদি ইচ্ছে করেন তবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এমন দেখা গিয়েছে যে কোনো একটি ছাত্র, আমরা যাকে "লেখাপড়া" বলি, তাতে তেমন কুশল নয়। মুখের ভাষা বা লেখার ভাষা ব্যবহারে তার স্বাচ্ছন্দ্য নেই। কিন্তু সংগীত বা চারুকলায় নিজের প্রকাশে সে পারঙ্গম। লেখাপড়ার বিকল্প বাহন তার সামনে ধরে দিলে সে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়। তার পর একদিন ভাষা-বাহন ব্যবহারে অস্বাচ্ছন্দ্যকেও সে জয় করিতে পারে। কিন্তু সেব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে নেই।

রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। একসময় তাঁর মনের সুদূর গভীরে অনেকগুলি ভাবনা চিন্তার জন্ম হচ্ছিল কিন্তু

সে চিন্তার বাণী-বহন তখনও তাঁর কাছে ধরা দেয়নি। রেখায় রঙে অবচেতন মনের সে ভাবনাগুলি নিয়ে তাঁর লীলা চলেছিল কিছুদিন ধরে। পরে যখন তাঁর বাণী পেলেন তখন আস্তে রেখা-রঙের ব্যবহার কমে এল। অনেক সময় যে-গভীর কথাটি কিছুতেই কাব্যে গেঁথে উঠতে পারছিলেন না, সেটি প্রথমে সুরে তাঁকে ধরা দিয়েছে। সুরের খেয়া বেয়ে ভাষার রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কবির সাহিত্যিক জীবনের এই পরম সত্যকে তিনি শিক্ষার জগতে শিক্ষার্থীর জন্য অনেক আগেই চিন্তা করে রেখেছেন। জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য আত্মপ্রকাশের তিনটি বাহন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু পশ্চিমী ধাঁচে আমরা যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছি, তাতে ভাষার একাধিপত্য। শুধু কথা ও লেখার পণ্ডিতদের সেখানে নিরবচ্ছিন্ন সমাদর। সংগীত এবং কারুকলা দুয়োরাণীর মতো বাহির অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছে।

An Eastern University নামক প্রবন্ধে তিনি অনুকরণীয় ভাষায় এর প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেন—

> "The Western Universities have not yet truly recognized that fullness of expression is the fullness of life. And a large part of man can never find its expression with mere language of words. It must therefore seek for its other languages—lines and colours, sound and movement"...

—পশ্চিমের আদর্শে গড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখনও একথা স্বীকার করে নেয় নি যে আত্মপ্রকাশের পরিপূর্ণতা থেকেই জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে; আর মানবসত্তার একটি বৃহৎ অংশ নিছক কথার ভাষায়

আত্মপ্রকাশের সম্পূর্ণতা খুঁজে পায় না। সুতরাং তাকে নির্ভর করতে হয় অন্যতম ভাষাগুলির উপর—সে ভাষা রেখা ও রঙের ভাষা; সে ভাষা ধ্বনি ও ছন্দের ভাষা।

আধুনিক শিক্ষার এই অসম্পূর্ণতার জন্য আমরা আজীবন জড়ত্বের বোঝা বয়ে মরি। হীন অস্পৃশ্যের মতো আমরা সংস্কৃতির উৎসব-মন্দিরের বহিরঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকি, ভিতরে প্রবেশের অধিকার পাই না—সেখানকার বর্ণ-সমারোহ, সেখানকার আনন্দঘন রূপবৈচিত্র্য আমাদের চোখে ধরা পড়ে না, সেখানকার সংগীতের মাধুরী আমাদের কানে প্রবেশ করে না। আমাদের শিক্ষা কারাগৃহের শিক্ষা, কঠিন পরিশ্রম এবং প্রয়োজনসর্বস্ব নিম্নরুচির সাজসজ্জায় তা পরিসমাপ্ত আমরা একথা ভুলে থাকি যে, বর্ণ, রূপ এবং প্রকাশের পূর্ণতা, পূর্ণতর জীবনেরই পাথেয়—আমরা ভুলে থাকি জীবনের আনন্দ জীবনী-শক্তিরই নামান্তর। কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীর একথা মনে হতে পারে যে, পত্রপুষ্পসম্ভার বৃক্ষের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় উচ্ছল অঙ্গসজ্জা। কিন্তু যদি ওগুলিকে জোর করে মেরে ফেলা হয় তবে একদিন বড়ো দুঃখেই একথা উপলব্ধি করতে হবে যে, এক ফোঁটা কাঠও তার ভাগ্যে জুটবে না।

সেজন্য সংগীত ও শিল্প শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে সংগীত বা কারুকলার ব্যবহার আছে কিন্তু তাদের স্থান পাঠ্যসূচীর অতিরিক্ত স্থানে, তাদের বলা হয় Extra-Curricular বা পাঠ্যসূচীর সহায়ক Co-Curricular। কিন্তু শিক্ষার্থীর মনের সুষম বিকাশে রবীন্দ্রনাথ সংগীত এবং শিল্পকে curricular বা পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত করেই স্বীকার করেছেন। সংগীত এবং নৃত্যরূপী দুঃখিনী দুয়োরাণীকে রবীন্দ্রনাথই প্রথমে শিক্ষার রাজপুরীতে আহ্বান করে এনেছিলেন।

আত্মপ্রকাশের বাহন হিসেবে সংগীতকে রবীন্দ্রনাথ ভাষাবাহনের থেকে গভীরতর বলে মনে করতেন। ভাষাকে প্রকাশের দৈন্য এড়াতে ক্ষণে ক্ষণেই সংগীতের সাহায্য নিতে হয়। সাদামাটা ভাষা যে গভীরতা প্রকাশ করতে পারে না, তার মধ্যে সংগীত লাগালেই সে গভীরতা তার আয়ত্তগম্য হয়।

শুধু আত্মপ্রকাশের বাহন নয়, আত্মার মুক্তিও গানের সুরেই তার কাছে ধরা দিয়েছে।

"গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে।"

অনির্বচনীয়তাকে উপলব্ধি করার এই মুক্ত শিশুর মনকে রুচিবান করবে এই আশায় রবীন্দ্রনাথ তার কাছে সংগীত-সাধনাকে উপস্থাপিত করেছিলেন। আমাদের দেশের শিক্ষায় শুধু জ্ঞানবিজ্ঞান নয়, কলা-বিদ্যাও সম্মানিত হবে এ আকাঙ্ক্ষা তাঁকে এই পরীক্ষায় নিয়োজিত করেছিল। তাঁর আকাঙ্ক্ষা আজও পূর্ণ হয়নি। তাই দেশের শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে তাঁর বহু প্রাচীন আবেদন আজও প্রাসঙ্গিক।

"আমাদের দেশের শিক্ষাবিভাগ কলাবিদ্যার সম্মানকে শিক্ষিত মনে স্বাভাবিক করে দেবেন এই নিবেদন উপস্থিত করবার অভিপ্রায়ে এই ভূমিকা মাত্র আজ প্রস্তুত করে এনেছি। আর যা-কিছু করবার আছে সে নানা অসামর্থ্য সত্ত্বেও আমার বিদ্যালয়ে আমি প্রবর্তিত করেছি।

মানুষ কেবল বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করেনি, অনির্বচনীয়তাকে উপলব্ধি করেছে। আদিকাল থেকে মানুষের সেই প্রকাশের দান প্রভূত ও মহার্ঘ। পূর্ণতার আবির্ভাব মানুষ যেখানেই দেখেছে কথায়,

সুরে, রেখায়, বর্ণে, ছন্দে, মানব সম্বন্ধের মাধুর্যে, বীর্যে, সেখানেই সে আপন আনন্দের সাক্ষ্যকে অমর বাণীতে স্বাক্ষরিত করেছে। শিক্ষার্থী যারা তারা সেই বাণী থেকে বঞ্চিত না হোক এই আমি কামনা করি ; শুধু উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে নয়, জগতে জন্মগ্রহণ করে সুন্দরকে দেখেছি, মহৎকে পেয়েছি, ভালোবেসেছি ভালোবাসার ধনকে, এই কথাটি মানুষকে জানিয়ে যাবার অধিকার ও শক্তি দান করতে পারে এমন শিক্ষার সুযোগ পেয়ে দেশ ধন্য হোক, দেশের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা অমৃত অভিষিক্ত গীতলোকে অমরত্ব লাভ করুক।" (শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান। শিক্ষার ধারা। ভাদ্র, ১৩৪৩)।

রবীন্দ্রনাথের এই আকুল আবেদন দেশের নিয়ামকদের দ্বারে উপস্থিত হয়ে বার বার অনুরণিত হোক এই কামনা।



রবীন্দ্রনাথ মূলত প্রকৃতির কবি। তাঁর কবিসত্তার প্রতি অণুতে প্রকৃতি-চেতনা মিশে আছে। প্রেমের অনুভূতি এবং ভগবানের উপলব্ধিও তিনি লাভ করেছেন এই প্রকৃতি চেতনার পথ ধরেই। কবি-জীবনের কোনো বিশেষ পর্বে তিনি যখন মানসী-প্রেয়সীর প্রেম-বৈচিত্র্য আস্বাদন করছেন, তখন সে বৈচিত্র্যকে প্রকৃতির দেহ-সৌরভের স্নিগ্ধতার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েই সে আস্বাদন তাঁর কাছে সত্য হয়েছে; অন্য কোনো পর্বে যখন ভাগবত অনুভূতি তাঁর চিত্তকে অধিকার করেছেন তখনও প্রকৃতির রূপানুবর্তনের মধ্যেই তিনি তাঁর বিচিত্র স্পর্শ লাভ করেছেন। তাছাড়া প্রকৃতিকে স্বতন্ত্রভাবে তিনি যখন উপভোগ করেছেন তখন তাঁর কবিসত্তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য, ধ্বনি এবং ছন্দের মধ্যে লীন করে দিয়েছেন। প্রকৃতি-প্রেমের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্য যে-কোনো কবির চেয়ে তাঁর কাব্য গভীর এবং ব্যাপক।

প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের প্রতি বিভিন্ন কবির আকর্ষণ ভিন্ন রকমের। মহাকবি বাল্মীকি অরণ্যের আর সমুদ্রের শোভামুগ্ধ কালিদাসকে নাগাধিরাজ হিমালয় বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। আর বাল্মীকির কাব্যের অরণ্যের নিবিড়তা তাঁর কাব্যে তপোবনের স্নিগ্ধতায় পরিণত হয়েছিল। পাশ্চাত্য কবি শেলি অনন্ত সমুদ্র আর অপার নীলাকাশে নিজের দৃষ্টিকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। সেগুলি তাঁর অশান্ত হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু সমুদ্র বা পর্বত তেমন করে আকর্ষণ করেনি। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১ খ্রীঃ) তিনি লিখেছিলেন,

> "কল্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলে না। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান্ বলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা মনে হয় না। তার কারণ আছে। আমি যখন বম্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতাম তখন দেখতেম, দূর দিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে; কল্পনায় মনে করতেম যে, একবার যদি ওই দিগন্তের আবরণ ভেদ করতে পারি—ওই দিগন্তের যবনিকা উঠাতে পারি—অমনি আমার সুমুখে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথলে উঠবে, ওই দিগন্তের পর যে কী আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকত, তখন মনে হত না ওই দিগন্তের পর আর এক দিগন্ত আসবে। কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চলছে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডির মধ্যে বসে আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সংকীর্ণ যে মন কেমন তৃপ্ত হয় না।" (প্রথম পত্র)

পাহাড় সম্বন্ধে একটি উক্তি আছে "ভানুসিংহের পত্রাবলীতে" (১৩৩৬-১৯২৯)।

"পাহাড় আমার কেন ভালো লাগে না বলি—সেখানে গেলে মনে হয়, আকাশটাকে যেন আড়কোলা করে ধরে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা করে দেওয়া হয়েছে, সে একবারে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা। আমরা মর্ত্যবাসী মানুষ —সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটি দেখতে পাই— সেই আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় পাহাড় একপাল মহিষের মতো শিং গুঁতিয়ে মারতে চায় তাহলে সেটা আমি সইতে পারিনে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত, সেইজন্য বাংলাদেশের বড়ো বড়ো দিল দরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেছি—···।" (আষাঢ়স্য তৃতীয় দিবসে, ১৩২৬)

এই পত্রাবলীর অন্যত্র আছে—

"নদী আমি ভারি ভালোবাসি, আর ভালোবাসি আকাশ। নদীতে আকাশে চমৎকার মিলন, রঙে রঙে, আলোয় ছায়ায়, ঠিক যেন আকাশের প্রতিধ্বনির মতো। আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায় না এই জলের উপর ছাড়া।" (২ শ্রাবণ, ১৩২৯)

নদীর সঙ্গে এই ভালোবাসার সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনেই ঘটেছিল। "জীবনস্মৃতি"তে আছে।—

"একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়নায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে আশ্রয় লইল। আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম।
এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল।" (বাহিরে যাত্রা)

পরবর্তী জীবনে যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের কিছু অংশ রবীন্দ্রনাথের কেটেছে পদ্মানদীর সাহচর্যে। শেষে তিনি এসেছিলেন বীরভূমে। সেখানকার নদীটির রূপ উদার নয়, গতি তির্যক। তাকেও তিনি আপনার সাহিত্যের সঙ্গী করে পেয়েছিলেন।

"পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে।...
একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহুদূরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি,
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপর।...
তারপরে যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে।
ছায়াবৃত সাঁওতাল-পাড়ার পুঞ্জিত সবুজ দেখা যায় অদূরে.
এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।"

নদীকে এত ভালবাসতেন বলেই রবীন্দ্রসংগীতে নদীর চিত্রকল্প বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। উদার আকাশের কথাও তাঁর গানে পুনপুন ভিড় করে এসেছে। গীতবিতান প্রথম পাতা থেকে আরম্ভ করে নির্বিচারে গানগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই একথার সত্যতা বোঝা যাবে।

১। "তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে
দেবে কিগো বাসা আমায় একটি ধারে ?"

২। "সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধনী॥"

৩। "আকাশ যবে শিহরি ওঠে গানে
গোপন কথা কহিতে থাকে ধরার কানে কানে—"

৪। "এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,—"

৫। "কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে…
দিশাহারা আকাশ-ভরা সুরের কূলে
সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে ॥"

৬। "দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—
আমার সুরগুলি পায় চরণ আমি পাইনে তোমারে ॥
বাতাস বহে মরি মরি, আর বেঁধে রেখোনা তরী—"

৭। "এল আঁধার ঘিরে, পাখি এল নীড়ে,
তরী এল তীরে—
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো
ওগো দুখজাগানিয়া ॥"

৮। "ওরে আমার হৃদয় আমার, কখন তোরে প্রভাতকালে
দীপের মতো গানের স্রোতে কে ভাসালে।"

৯। "অর্ঘ্য তোমার আনি নি ভরিয়া বাহির হতে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের আপন স্রোতে।"

১০। "হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়, হায় সজনি
উথলে নয়ন বারি।"

এইসব গানের মধ্যে মাঝে মাঝে "সাগর" বা "পারাবার" নেই তা নয় কিন্তু কবি সাগরের বুক থেকে সাগরের তীরই বেশি পছন্দ করেন। তাঁর তরী নদী পার হয়ে বড়ো জোর সমুদ্রের মোহনা পর্যন্ত যায়, "সমুখে শান্তি পারাবার" দেখে শুধু তরী ভাসায়। সমুদ্রের তরঙ্গ লীলায় তাঁর অভিসারের পরিচয় নেই। "পূরবী" কাব্যটির অধিকাংশই সমুদ্রের বুকে জাহাজে বসে লেখা কিন্তু

কবিতাগুলির মধ্যে সমুদ্রের চিত্রকল্প প্রায় নেই বললেই হয়। কবিতাগুলির চিত্রসম্পদ বাংলাদেশের উপকূল থেকেই সংগৃহীত। "সমুদ্র", "ঝড়" ও "পদধ্বনি" নামে তিনটি কবিতাতে সমুদ্রের রূপবর্ণনা আছে কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই সে রূপবর্ণনা কবি চিত্তের কোনো একটি জীবনদর্শনে এসে পরিসমাপ্ত হয়। আণ্ডেস জাহাজে বসে লেখা পূরবী কাব্যে ধৃত একটি কাব্যগীতি আছে, "আনমনা গো, আনমনা।" তাঁর চিত্রকল্পটি গ্রাম-বাংলার, যেখানে নদী আর আকাশ মিশে আছে।—

'জনশূন্য তটের পানে ফিরবে হাঁসের দল ;
স্বচ্ছ নদীর জল
আকাশ পানে বইবে পেতে কান,
বুকের তলে শুনবে বলে গ্রহতারার গান,
কুলায় ফেরা পাখি
নীল আকাশের বিরাম খানি রাখবে ডানায় ঢাকি
বেণু শাখার অন্তরালে অস্তপারের রবি
আঁকবে মেঘে মুছবে আবার শেষ বিদায়ের ছবি ···।"

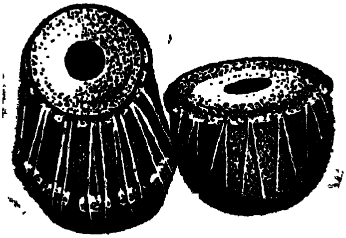
বিদেশে গিয়ে নূতন যে ফুলের গন্ধ তাঁকে আকুল করেছে তাঁকেও কোনো দেশী চেনা ফুলের সঙ্গে সংগত করে তবে তাঁর মন তৃপ্ত হয়েছে। এই তৃপ্তির একটি গান আছে।

"মন যে বলে চিনি চিনি
যে-গন্ধ বয় সমীরে,
কে ওরে কয় বিদেশিনী চৈত্ররাতের চামেলিরে।"

বাংলাদেশের "দিলদরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে" রবীন্দ্রনাথ তাঁর "গানের গলা সেধেছিলেন" একথার

তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। ইউরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংগীতের প্রভেদ হয়তো একদিন রবীন্দ্রসংগীতের পদচিহ্ন ধরেই প্রকাশ হয়ে পৃথিবীকে আশ্চর্য করে দেবে। এটা হবে শুধু সুরের আবিষ্ট মোহময়তার জন্য নয়, বহু পরিমাণে তার বাণীর স্পষ্ট বিশিষ্ট পরিবেশের জন্যেও। রবীন্দ্রসংগীতে অঙ্গে অঙ্গে আদিগন্ত প্রসারিত নদী এবং উদার আকাশের যে দৃশ্যসৌরভ মিশে আছে তাও একদিন বিশ্ববাসীর সংগীত পিপাসু মনকে আকর্ষণ করবে। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্র-সংগীতের এই পরিবেশটির কথা স্পষ্ট ভাষায় ইয়োরোপীয় সংগীতের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে আলোচিত হয়েছে।

> "য়ুরোপের সংগীত প্রকাণ্ড এবং বিচিত্র, মানুষের বিজয় রথের উপর থেকে বেজে উঠেছে। ধ্বনিটা দিগদিগন্তের বক্ষস্থল কাঁপিয়ে তুলছে। বলে উঠতেই হয়, বাহবা। কিন্তু আমাদের রাখালী বাঁশিতে যে রাগিণী বাজছে, সে আমার একলার মনকে ডাক দেয় একলার দিকে, সেই পথ দিয়ে যে পথে পড়েছে বাঁশবনের ছায়া, চলেছে জলভরা কলসী নিয়ে গ্রামের মেয়ে, ঘুঘু ডাকছে আম গাছের ডালে, আর দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাঝিদের সারিগান— মন উতলা করে দেয়। চোখটা ঝাপসা করে দেয় একটুখানি অকারণ চোখের জলে। অত্যন্ত সাদাসিধে সেই জন্যে অত্যন্ত সহজ মনের আঙিনায় এসে আঁচল পেতে বসে।" ( ৮ আগষ্ট ১৯৩০ )



পৃথিবীতে এমন কবি আছেন, যাঁদের কাব্যের পরিবেশকে কোনো বিশেষ অঞ্চলের বলে চিহ্নিত করা যায় না। সে পরিবেশ সামান্য ধর্মী। পাহাড় নদী সমুদ্র অরণ্য সে পরিবেশে আছে কিন্তু সে পাহাড় যেন কোনো বিশেষ দেশের নয়, সমুদ্রের তরঙ্গলীলা বা অরণ্যের নিবিড়তার রূপ তো সাধারণভাবেই নির্বিশেষ। কিন্তু নদীকে অসামান্য রূপে উপস্থাপিত করাই সাধারণ রীতি। তবুও অনেক কবির কাব্যে নদীও সামান্য রূপেই চিত্রিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জাত আলাদা। তাঁর কাব্যে এবং গানে পদ্মা তীর এবং বীরভূমের রুক্ষ প্রান্তর মিলে সমগ্র বাংলাদেশের একটি নিবিড় অন্তরঙ্গ রূপ ধরা পড়েছে। পরবর্তী জীবনের গানে বাংলাদেশের দুপ্রান্তের দুটি স্বতন্ত্র রূপের সমন্বয়ও ঘটেছে।

ইংরেজি সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের জুড়ি অন্তত দুজন লেখক আছে।

একজন ইউলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্থ আর একজন টমাস হার্ডি। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কাব্যে ইংলণ্ডের লেক-অঞ্চল পৃথিবীর কাব্য রসিকদের কাছে চিরপরিচিত রূপলাভ করেছে। টমাস হার্ডি-র কাব্যে দক্ষিণ ইংলণ্ডের ওয়েসেকস অঞ্চল চিরকালীন মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী দুজন লেখকের লেখায় বাংলাদেশের দুটি অঞ্চল অনুরূপ ভাবেই প্রকাশিত। দুজনেই কথা-সাহিত্যিক। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম বাংলার বীরভূম অঞ্চলকে তাঁর লেখার পরিবেশ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, আর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মাতীরকে। রবীন্দ্রনাথের গানে পদ্মা তীরের বর্ষা এবং শরৎ বিধৃত হয়ে আছে। তেমনি সব ঋতুর গানেই তাঁর উত্তরজীবনের সঙ্গী বীরভূমের পরিবেশ অনুকূল পটভূমি রচনা করেছে। তবুও মনে হয় বীরভূমের বর্ষা এবং বসন্তকেই কবি তাঁর গানে বেশি করে ব্যবহার করেছেন।

> "নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
> ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে॥"

এই ধ্রুবপদটিতে গানের পরিবেশটি স্পষ্ট নয়। কিন্তু পরবর্তী পংক্তিতেই পদ্মাতীরের পরিবেশ আভাসিত।

> "বাদলের ধারা ঝরে ঝরো ঝরো আউষের ক্ষেত জলে ভরো ভরো,
> কালীমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ বাহিরে।

পরবর্তী কলিতে সে পরিবেশ তার সমস্ত উপাদান নিয়ে কালীমাখা মেঘের মতোই ভিড় করে এসেছে।

> "ওই শোনো শোনো পারে যাবে বলে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
> খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজিরে।

পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ, দুকূল বাহিয়া উঠে পাড়ে ঢেউ
দরো দরো বেগে জলে পড়ি জল ছলো ছলো উঠে বাজিরে।
খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে আজিরে॥"

গানের পরবর্তী অংশে "ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘন ঘন" কিংবা "ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল" ইত্যাদি অংশে সে-পরিবেশের রেশ অনুরণিত হয়ে থাকে। কিন্তু

"আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে,
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে॥
শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে
জল ছুয়ে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের পরে।"

এ গান পরিপূর্ণভাবেই বীরভূমের পরিবেশের গান। পরবর্তী অংশে এই পরিবেশ আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

"আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে॥
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, লুটেছে ঐ ঝড়ে—"

পূববাংলার বর্ষা প্রগাঢ়-যৌবনা নারীর মতো মন্থর গতি, আর বীরভূমের বর্ষা বহুলাংশে নটরাজের মতো নৃত্যে মুখর। এ দুটি বিপরীতধর্মী চিত্র রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন করে প্রকাশ পেয়েছে তেমন আর কোথাও পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

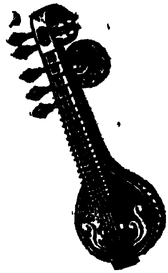
অন্যান্য ঋতুর গানেও সমগ্র বাংলাদেশের চিত্র রঙে গন্ধে ছন্দে রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে উজাড় করে দিয়েছেন। তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথের ঋতু সংগীতের ডালিতে বর্ষা এবং বসন্তেরই প্রাধান্য। একক প্রাধান্য হয়তো বর্ষার।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করলে এর কারণ বোঝা যাবে।—

> "ভারতবর্ষে প্রত্যেক ঋতুরই একটা না একটা উৎসব আছে। কিন্তু কোন্ ঋতু যে নিতান্ত বিনা কারণে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা যদি দেখিতে চাও সংগীতের মধ্যে সন্ধান করো। কেননা, সংগীতেই হৃদয়ের ভিতরকার কথাটা ফাঁস হইয়া পড়ে।
>
> বলিতে গেলে ঋতুর রাগরাগিণী কেবল বর্ষার আছে, আর বসন্তের। সংগী - শাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুরই কিছু সুরের বরাদ্দ থাকা সম্ভব, কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। ব্যবহারে দেখিতে পাই, বসন্তের জন্য আছে বসন্ত আর বাহার। আর বর্ষার জন্য মেঘ, মল্লার, দেশ আরও বিস্তর। সংগীতের পাড়ায় ভোট লইলে বর্ষারই জিত হয়।"

প্রাচীন ভারতবর্ষের কবি এবং সুর স্রষ্টাদের মতো রবীন্দ্রনাথেরও তাই বর্ষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল। তার পরই হয়তো বসন্তের প্রতি। তবে শরৎ ঋতুকেও রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন ভাবমূর্তি দান করেছিলেন। যথাস্থানে তার আলোচনা করতে হবে। বর্ষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানে দুই বাংলার চিত্রই সমান মর্যাদা পেয়েছে। শরতের গানে পূব বাংলার মর্যাদা বেশি, আর বসন্তের গানের পরিবেশ বেশি করে রচনা করেছে বীরভূমের রুক্ষ প্রান্তর। তারও হয়তো কারণ আছে। পূববাংলার বর্ষা ব্যাপকতা নিয়ে আসে, সমস্ত প্রকৃতির উপর বিচ্ছিন্ন অধিকার বিস্তার করে। তারপর শরত যেন একটি

নূতনত্ব বহন করে আনে। বীরভূমে শরতের এই নূতনত্বের স্বাদ এত গভীর নয়। অপরপক্ষে শীতের অধিকার ওখানকার প্রকৃতির উপর বেশি ব্যাপক। সুতরাং বসন্ত শীতের জড়তা থেকে মুক্তির গানে মুখর।



ঋতু বৈচিত্র্য প্রকৃতির রূপে যে পরিবর্তন বর্ষে বর্ষে বয়ে নিয়ে আসে তা পৃথিবীর সকল কবিকেই মুগ্ধ করেছে। তা নিয়ে কত কবিতা কত গানে বিশ্বের সব অঞ্চলের সাহিত্যই সমৃদ্ধ হয়ে আছে। ভারতবর্ষের প্রকৃতিও তাঁর কবি এবং গীতিকারকে অনন্য সাধারণ সমৃদ্ধি দিয়েছে। তবে প্রকৃতিকে কাব্যের প্রধান অবলম্বন করে কাব্য বা সংগীতরচনা আধুনিককালের সৃষ্টি। পূর্বকালের অধ্যাত্ম রসের এবং প্রেমের কাব্য বা সংগীতে প্রকৃতির স্পর্শে আনন্দময়তা বা কারুণ্য দান করেছে। কোনো কোনো সময় কোনো প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ বা ঋতুচক্রের কোনো একটি শরিকের মধ্যে জীবত্ব আরোপ করা হয়েছে। ঋকবেদেই উষা বা সন্ধ্যাকে প্রেমিকা নারীর রূপ দেওয়া হয়েছে। সূর্যের আলো ভুবনজয়ী সম্রাটের রূপ পেয়েছে। পরবর্তী বহু কাব্যে কোনো কোনো ঋতুতে বিশেষ করে "বসন্ত" ঋতুতে জীবত্ব আরোপ করা হয়েছে। তিনি ঋতুরাজ।

রবীন্দ্রনাথের গানে প্রায় প্রত্যেকেই একটি বিশেষ রূপ দিয়ে তার মধ্যে মানবত্ব আরোপ করা হয়েছে কখনো আভাসে কখনও স্পষ্টভাবে। কিন্তু বাহিরের রূপের থেকে অন্তরের মাধুর্য্যেই তাদের মধ্যে মানবত্ব আরোপ বেশি করে সার্থক হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীত এবং সাহিত্যে গ্রীষ্মের একমাত্র প্রতিনিধি বৈশাখ। বৈশাখকে তিনি মৌনী তাপস রূপে কল্পনা করেছেন। তাঁর ভরাল জটায় মাঝে মাঝে আকাশকে আচ্ছন্ন করে নিঃশ্বাস রাখে।

সম্বৎসরের পুঞ্জীভূত গ্লানি দূর করে একই তাপস পৃথিবীকে শুচিস্নানে পুণ্য করে দেন।

"এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।...
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।"

অথবা

"বৈশাখ হে, মৌনী তাপস, কোন অতলের বাণী
এমন কোথায় খুঁজে পেলে।
তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি মন্থর মেঘখানি
এল গভীর ছায়া ফেলে॥"

এই গানগুলির মধ্যে বৈশাখ-এর এই পৌরুষ দীপ্ত রূপ প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু এই অগ্নিবর্ষী শুষ্ক কঠোর রূপেই তাঁর বৈশাখকে দেখা শেষ হয়নি, "প্রলয়ের শাঁখ" এর মন্ত্র রবে বৈশাখের পদধ্বনি নিঃশেষিত হয় না। তাঁর প্রস্থান "শ্যামলরূপে করুণ-সুধা ঢেলে" দিয়ে,

"সারা হয়ে এল দিন
সন্ধ্যামেঘের মায়ার মহিমা নিঃশেষে হবে লীন
দীপ্তি তোমার তবে শান্ত হইয়া রবে,
তারায় তারায় নীরব মন্ত্রে ভরি দিবে শূন্য সে॥"

রবীন্দ্রসংগীতে বর্ষার যে কত বিচিত্র রূপ অঙ্কিত হয়েছে তার সীমা নেই। কখনো "নব-যৌবনা বরষা" "ভুবনভরসা"। কখনো "নীলঅঞ্জন ঘনকুঞ্জ ছায়ায়" তাঁর গম্ভীর রূপ। কখনও বাউলের মতো একতারা বাজিয়ে তাঁর বিশ্ব রঙ্গ মঞ্চে প্রবেশ। কখনও "বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা" মালা কণ্ঠে দুলিয়ে তিনি আকাশের অঙ্গনে উপস্থিত। কখনো ধরণীর উৎসব সভায় শ্রাবণরূপী বর্ষা বীণাপাণি রূপে অধিষ্ঠিতা। একটি গানে বর্ষা স্বপ্নমায়া রূপিণী। চিত্রসম্পদে তাঁর তুলনা নেই। পটভূমি বীরভূমের। বর্ষার পদপ্রান্তে তাই রক্ত অলক্তক। হঠাৎ মেঘমুক্ত আকাশে ঈশৎ স্ফুরিত চন্দ্রকলাও এই বর্ষারূপিণীর সিঁথিপ্রান্তে সিঁদুররূপে আপনার স্থান করে নিয়েছে।

> "মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধছায়া নীপ কুঞ্জতলে,
> শ্যাম কান্তিময়ী কোন্ স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে॥
> ফিরে রক্ত-অলক্তক-ধৌত পায়ে ধারা-সিক্ত বায়ে,
> মেঘ মুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা সিঁথি-প্রান্তে জ্বলে॥"

শেষ পর্বের একটি বর্ষার গানে তিনি "নীলিম" কান্তি একটি সাঁওতাল ছেলেকে বর্ষার দূত হিসেবে কল্পনা করে বর্ষাপ্রকৃতির উপাদানগুলি দিয়ে তাঁর লাবণ্য রচনা করেছেন। ওয়ার্ডস ওয়ার্থের মানসীকন্যা Lucy যেমন বহুবর্ষ ধরে Grew up in sun and shower. প্রকৃতি তাই Lucy দেহে এবং মনে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের সাঁওতালী ছেলেটিকেও তেমনি

> "পুব-দিগন্ত দিল তবে দেহে নীলিমারেখা,
> পীত ধড়াটিতে অরুণ রেখা।"

বর্ষার বায়ুচঞ্চল তমালবনে কবি এই "সাঁওতালী ছেলেটিকে সঙ্গীরূপে পেয়েছেন। বর্ষার "হংসবলাকাপাঁতি" দেখে তার মনে যে-গান গুঞ্জরিত হয়েছে সেখানেও কবি তার শরিক।

"আমার গানের হংসবলাকাপাঁতি
বাদল-দিনের তোমার মনের সাথি
ঝড়ে চঞ্চল তমালবনের প্রাণে
তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি একখানে,
মেঘের ছায়ায় চলিয়াছি ছায়া ফেলে ॥"

শুধু আয়তনে নয়, গভীরতায়ও রবীন্দ্রসংগীতে বর্ষাঋতুর প্রাধান্য। কবির আনন্দ-বেদনা এবং পরমা তৃপ্তি তাঁর বর্ষার গানকে অবলম্বন করেই প্রকাশিত হয়েছে।

"বনের ছায়ার জল ছলছল সুরে
হৃদয় আমার কানায় কানায় পুরে।
খনে খনে ওই গুরু গুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্গ বাজে ॥

বাদল-সন্ধ্যার এই অনুকূল দৃশ্য সম্পদকে অবলম্বন করে কবি হৃদয়ের গভীর রোমান্টিক আনন্দ বেদনায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন।

"কোন্ দূরের মানুষ এল আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা
গোপন মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা।
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি—
হার মানি তার অজানা জনের সাজে ॥"

অন্তরতমর এই চির অচেনা রূপ চির অধরা বিরহ রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রেরণাকেই প্রাচীন হয়ে যেতে দেয়নি। বর্ষার বেদনা মথিত নিবিড় আনন্দের এই গানটির সুরেও উপলব্ধির অনন্ত-আনন্দ এবং না-পাওয়ার চির-বেদনা মূর্ত হয়ে আছে।

অন্যত্র একথা বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে এবং গানে দুটি ধ্রুপদী ( Classical ) পরিবেশনকে তাঁর নিজের কাব্যের পরিবেশ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে একটি কালিদাসের কাব্যের এবং অন্যটি বৈষ্ণব কাব্যের পরিবেশ। দুটি প্রাচীন পরিবেশেই বর্ষা ঋতুর প্রাধান্য ছিল। সে-প্রাধান্য রবীন্দ্রনাথের গানকেও অবলম্বন করেছে।

"বকুল মুকুল রেখেছে গাঁথিয়া,
বাজিছে অঙ্গনে মিলন বাঁশরি।
আনো সাথে তোমার মন্দিরা,
চঞ্চল নৃত্যের বাজিবে ছন্দে সে—
বাজিবে কঙ্কণ, বাজিবে কিঙ্কিণী,
ঝঙ্কারিবে মঞ্জীর রুণু রুণু।"

এই গানে কালিদাসের কাব্যের পরিবেশের স্পষ্টতা নেই, শুধু আভাসে সে-যুগে মানসিক প্রস্থান আছে। বর্ষার ধারা পতনের মন্দিরা-ধ্বনিকে সখীদের কঙ্কণ-কিঙ্কিনী সুরে বেঁধে কবি সেই দীর্ঘ পথ অবলীলাক্রমে পেরিয়ে গিয়েছেন। অন্য অনেক গানে কালিদাসের পবিবেশের স্বাক্ষর স্পষ্টতর।

"বহু যুগের ওপার হতে আবার এল আমার মনে,
কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরো ঝরো বরিষণে॥ ··
সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবা নদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈল শিরে।
মালবিকা অনিমিখে চেয়েছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে॥"

অন্য একটি গান যদিও বর্ষার গানের বিভাগে স্থান পায়নি তবু এর পুরো পরিবেশ "মেঘদূত" কাব্যের বিরহ-ব্যথা নিষিক্ত মেঘলোকের :

কদম্ববন, জম্বুপুঞ্জ মন্থর নব মেঘ এবং সর্বোপরি "কান্ত বিরহ কান্তার" পন্থহারা কবি চিত্তকে কালিদাসের যুগের অভিমুখী করে তুলেছে।

"নীলাঞ্জন ছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত, বনবীথিকা ঘন সুগন্ধ।
মন্থর নব নীল নীরদ পরিকীর্ণ দিগন্ত;
চিত্ত মোর পন্থ হারা কান্ত বিরহ কান্তারে ॥"

বৈষ্ণব কাব্যের বর্ষার চিত্রও ক্ষণে ক্ষণে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানে দেখা দেয়।

"ঝর ঝর বরিষে বারিধারা
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা ॥"

এই গানটিতে যদিও বৈষ্ণব কবিতা বা রাধাকৃষ্ণের কোন উল্লেখ নেই, তবু মনের অজান্তে বর্ষাভিসারিকা রাধার একটি চিত্র আভাসিত হয়ে ওঠে। সে আভাস আরও স্পষ্ট পরবর্তী কলিতে,

"আঁধারা যমুনা তরঙ্গ আকুলা অকুলা রে
তিমির দুকূলা রে।"

ভয় বিহ্বলা অভিসারিণী অসহায়তা তরঙ্গ আকুলা যমুনার চিত্রের সঙ্গেই আমাদের মানস চক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব কাব্যের পরিবেশের সংস্কারকে এই গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম বর্ণপ্রলেপে সুন্দর করে তুলেছেন। "ভানু সিংহের পদাবলী"তে বৈষ্ণব কাব্যের পরিবেশ, বিশেষ করে বর্ষা ঋতুর পরিবেশ প্রয়োজনীয় ভাবেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো স্বতন্ত্র বর্ষাঋতুর গানে এই পরিবেশ বৈষ্ণব কবিতার সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ।—

"আজি শ্রাবণঘনগহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে সবার চিঠি এড়ায়ে এলে ॥"

এটি অবশ্য মেঘনিবিড় শ্রাবণ প্রভাতের বর্ণনা কিন্তু এর সঙ্গে চণ্ডীদাসের বিপরীত অভিসারের বর্ণনার কি আশ্চর্য মিল রয়েছে। সে অভিসার নিশাভিসার।—

"আজি এ রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

নিশাভিসারের অনুরূপ বর্ষা-বর্ণনাও রবীন্দ্রসংগীতে আছে

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার ॥
আকাশ কাঁদে হতাশ সম নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম, চাই যে বারে বার ॥"

এ-গানটি প্রকৃতি অংশে বর্ষাবর্ণনার মধ্যে ধরা হয়েছে। প্রেমের বহু গানে শাশ্বত প্রেমিক-প্রেমিকা রাধাকৃষ্ণ লীলার সংস্কৃতি স্পষ্টভাবেই আছে। "আজি যে রজনী যায়" গানটিতে "বৃথা অভিসার" "যমুনা-তীর" "কুঞ্জদুয়ার" ইত্যাদি সব উপাদানই ভিড় করে এসেছে।

বর্ষাঋতুকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের দুটি "নাট্যগীতি" আছে। "শেষবর্ষণ" ও "শ্রাবণ গাথা"। বসন্তকে অবলম্বন করেও দুটি "বসন্ত" এবং "নবীন"। বসন্তের পটভূমিতে গীতবহুল আর একটি নাটক হল "ফাল্গুনী"। তাছাড়া "রাজা" বা পরিবর্তিত রূপ "অরূপ রতন"

নাটকেও বসন্তঋতুর পূর্ণ অধিকার পরিবেশ এবং বাকি উদ্দিষ্ট জীবন দর্শনে। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ ঋতুকে নিয়ে একটি দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা বোধহয় "শারদোৎসব" নাটকেই প্রথম হয়েছে। নাটকের গানগুলি সে তত্ত্বের শুধু পরিবেশ রচনা করেছে তাই নয়, যে কথা নিছক ব্যাখ্যায় শুষ্ক তত্ত্বে পরিণত হত, গানের তরী বেয়ে কবি সে তত্ত্বকে আনন্দময় উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন।

বর্ষার রূপসৃষ্টিতে কবি প্রাচীন ধারাকেই মোটামুটি অনুসরণ করেছেন, তবে ব্যাপ্তি এবং গভীরতায় পূর্বতন কবিদের অতিক্রম করে গিয়েছেন। কিন্তু শরৎ ঋতুর একটি নিজস্ব নূতন রূপসৃষ্টি কবির সাহিত্য এবং সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাঙালির উপলব্ধিতে শরৎ ছুটির ঋতু। রবীন্দ্রনাথের গানেও শরতের আবাহন ছুটির ঋতু হিসেবেই।

"মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি রে ভাই আজ আমাদের ছুটি।"

প্রাচীন সাহিত্যে শরৎ ঋতুর একটি নারীরূপ ছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যে শরৎ অবকাশের আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। শরতের "মেঘের সাথে রোদের খেলায়" বিচ্ছিন্ন বর্ষণে আর শিউলি ফুলের উদাস গন্ধে কি যেন একটা রহস্যময়তা আছে। এই রহস্যময়তা কবির মনে একটি আসক্তিহীন রাগিণী বাজিয়ে তোলে। শরতের গানগুলি এই নিরাসক্ত বাউলের একতারাতে বাঁধা।

"অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী-বাওয়া॥
কোন্ সাগরের পার হতে আনে কোন্ সুদূরের ধন,
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া॥"

অথবা

> "তোমরা যা বলো তাই বলো, আমার লাগেনা মনে।
> আমার যায় বেলা যায় বয়ে কেমন বিনাকারণে॥
> এই পাগল হাওয়া কী গান-গাওয়া
> ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি সুনীল গগনে॥"

শারদোৎসব নাটকে কবি শরতকে অনাসক্ত নিঃসম্বল সন্ন্যাসী বলেছেন। তাঁর সঞ্চয়ের বন্ধন নেই তাই নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দিতেও নেই কোনো আশঙ্কা। শারদোৎসবে বিষয়ী এবং সঞ্চয়াভিলাষী লক্ষেশ্বর পর্যন্ত বলেছেন,

> "আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারিনে।"

কিন্তু অর্থহীন অবকাশের মধ্যে একটি অনর্থের সম্ভাবনা নিহিত আছে। অবকাশের আনন্দ যদি কর্তব্যবুদ্ধিকে খর্ব করে উত্তাল হয়ে ওঠে সে আনন্দ বাঁধনহীন প্রেমের মতোই মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আনন্দ সৌন্দর্য প্রেম—এ সবকিছুরই একটি দৃঢ় অবলম্বন চাই। শরতের ছুটির আনন্দকেও তাই রবীন্দ্রনাথ ঋণশোধের কঠিন সাধনার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। এই তত্ত্বটিকে ঘিরেই তার "শারদোৎসব" এবং পরিবর্তিত "ঋণশোধ" নাটক দুটির সৃষ্টি। "শারদোৎসব" নাটকে ছেলেরা যখন ছুটির আনন্দে মত্ত তখন উপনন্দ তাঁর প্রভুর ঋণশোধ করার জন্য পুঁথি লিখতে বসেছে দেখে শিশুদের আনন্দের সঙ্গী ঠাকুরদার মনে দুঃখ বেজেছিল।

> "আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ওপারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এপারে ধানের ক্ষেতের সবুজে চোখ একবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পূজার গন্ধ ভরে উঠেছে, এরি মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণ শোধের আয়োজনে বসে গেছে, এও কি চক্ষে দেখা যায়?"

এর উত্তরে ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীরূপী রাজা বলেছিলেন,

> "বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে? ঐ ছেলেটাই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ। তোমার এত ছুটির আয়োজন তো আমরা ব্যর্থ করতে পারব না।"

অবকাশের আনন্দ আর ঋণশোধের আয়োজন মিলে কবির মনের একটি বিশিষ্ট জীবন দর্শনেরও সৃষ্টি হয়েছে। শারদোৎসবের সন্ন্যাসীর উক্তিতেই এই জীবন দর্শনটি ব্যক্ত হয়েছে।

> "আমি অনেকদিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন? কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করেছে! বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে! সেই জন্যই ধানের ক্ষেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেই জন্যেই এত সৌন্দর্য।"

গ্রীষ্মকে নিয়ে যেমন কোনো গীতিনাট্য রচিত হয়নি হেমন্ত ও শীতকে নিয়েও তেমনি। কিন্তু 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' নামক গীতিনাট্যে সব ঋতুরই ভূমিকা আছে। রবীন্দ্রসংগীতে হেমন্ত ঋতু হেমন্ত-লক্ষ্মীর রূপে প্রতিভাত।

> "হায় হেমন্ত লক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা,
> হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।"

এই হেমন্তলক্ষ্মীর বিরল-ভূষণ বৈরাগ্যের অন্তরালে, কুয়াশার আবরণে সৌন্দর্যের মধ্যে একটি দানরিক্ত গোপনতার আনন্দ কবির চোখে ধরা পড়েছে।

"ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে।
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে ॥
আপন দানের আড়ালেতে রইলে কেন আসন পেতে,
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন করে রাখা ॥"

শস্যশালিনী প্রকৃতি হেমন্তলক্ষ্মীর রূপটি রিক্ত প্রসন্নতার। এই প্রসন্নতার অমৃত কবি নিজের জীবনে যাচ্ঞা করেছেন। সে গানে অবশ্য হেমন্ত ঋতুকে নারীরূপে নয়, পুরুষ রূপেই কল্পনা করা হয়েছে।

"নমো, নমো, নমো।
তুমি ক্ষুধার্ত জন শরণ্য,
অমৃত-অন্ন-ভোগধন্য করো অন্তর মম ॥"

"ভূষণ বিহীন" "হেমন্তের দিন"এর আপাতরিক্ত সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা শীতঋতুতে। ঋতুনাট্যের অধিদেবতা নটরাজের শুষ্ক কঠিন রূপ শীতের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে অধিকার করে।

"এ কী মায়া, লুকাও কায়া জীর্ণ শীতের সাজে।
আ...র সয়না প্রাণে, কিছুতে সয় না যে ॥
কৃপণ হলে হে মহারাজ রইবে কি আজ
আপন ভুবন মাঝে।"

আসন্ন বসন্তের পলাশ কাঞ্চনের বর্ণ বৈচিত্র্যের প্রগলভতায় নব-যৌবনের যে আনন্দ ফুলে ফুলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে শীতের রিক্ত বৈরাগ্য যেন তারি প্রস্তুতির তপস্যা।

"সইবেনা সে পাতায় ঘাসে চঞ্চলতা,
তাই তো আপন রং ঘুচাল ঝুমকো-লতা।
উত্তর বায় জানায় শাসন পাতল তপের শুষ্ক আসন,
সাজ-খসাবার এই লীলা কার অট্টরোলে॥"

শীতের খেলা "শূন্য করে দেবার খেলা", কারণ বসন্তের পূর্ণতা এই শূন্যতাকে ভরিয়ে দেবার পূর্ণতা।

বসন্ত নব-যৌবনের ঋতু। বসন্ত প্রধানতঃ মিলন দিনেরও ঋতু। বিরহ আর মিলনাকাঙ্ক্ষা, অকারণ উদ্বেগ বসন্তে নেই তা নয় কিন্তু আনন্দ উচ্ছলতাই বসন্তকে বিশেষ করে অধিকার করে। "একটুকু ছোঁয়া" একটুকু শোনা গান থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে বসন্ত উত্তাল আনন্দে বিশ্ব-প্রকৃতিকে পূর্ণ করে দেয়।

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে করোনা বিড়ম্বিত তারে॥
আজি খুলিয়ো হৃদয় দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো
এই সংগীত মুখরিত গগনে তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো
এই বাহির-ভুবনে দিশা হারায়ে দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে॥"

আনন্দের উচ্ছল প্রগলভলীলায়, নব-যৌবনের ক্ষ্যাপামির তরঙ্গে পুষ্প থেকে অন্যতর পুষ্পে, অভ্যস্ত সৌন্দর্য থেকে নূতনতর সুষমায় বসন্ত কেবলি নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চায়। বসন্ত সংগীতের ভাষায় এবং সুরে এই প্রগলভতার বাণী রবীন্দ্রনাথ ধরে রেখেছেন।—

"ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখিনিরে
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণ সমীরে।...

জানিনে ভাই, ভাবিনে তাই কি হবে মোর দশা
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরা খসা।
এই কথা মোর শূন্য ডালে বাজবে সেদিন তালে তালে
'চরম দেওয়ার সব দিয়েছি মধুর মধুযামিনীরে'।"

কিন্তু পরিনামের লক্ষ্য-বিহীন উদ্দাম অপচয় কবির জীবন দর্শনের সঙ্গে খাপ খায় না। লক্ষ্যহীন আনন্দও তাঁর বিশ্বাসের সঞ্চয় নয়। ফুলের আপাত পরিণামহীন বর্ণবিলাস থেকে ফলের পরিণত সার্থকতায় কবির বসন্তের পরিপূর্ণতা। বসন্তের নীড়-হারা বিহঙ্গদের তাই তিনি আবার নীড়ে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করেছেন।

বসন্ত তোর শেষ করে দে রঙ্গ।
ফুল ফোটাবার খ্যাপামি, তার উদ্দাম তরঙ্গ॥
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার মাতন তোমার থামুক এবার,
নীড়ে ফিরে আসুক তোমার পথহারা বিহঙ্গ॥...
প্রখর তাপে জরজর ফল ফলাবার শাসন ধরো
হেলা ফেলার পালা তোমার এই বেলা হোক ভঙ্গ॥"

কবির আনন্দ সৌন্দর্য প্রেম সবই পরিণতির দিকে প্রসারিত। পক্ষ-হীনতায় তাদের পরিসমাপ্তি নয়। নব যৌবনের ঋতু বসন্তকেও তাই কবি গানে গানে প্রৌঢ় পরিণতির রূপ দিয়েছেন। বসন্ত নাটকের সংলাপের একটি অংশের উল্লেখ করা যেতে পারে।

"কবি: পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা। বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা।
রাজা: আমি কিন্তু পূর্ণ হওয়ার খেলাটাই পছন্দ করি।
কবি: যথার্থ পূর্ণ হয়ে উঠলে রিক্ত হওয়ার খেলার ভয় থাকেনা।"

অন্যত্র আছে

> "কবি: আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার একপিঠে নূতন একপিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা ঝরা ফুল, আবার যখন পালটে নেন তখন সকাল বেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী, তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনক-চাঁপা।"

প্রৌঢ় অনুভূতির শাসনে যে নব যৌবন নিয়ন্ত্রিত সে নিরাসক্ত যৌবনের গানই কবির বসন্তের গানের জীবন দর্শন। 'ফাল্গুনী' নাটকে ছেলের দল অদেখা বার্ধক্যের ভূতটিকে কোথাও খুঁজে পায়নি। দৃশ্যজগতে যখন যৌবনের আনন্দ আর গতিবেগ ফুরিয়ে যায় তখন অদেখা মনের জগতে প্রৌঢ় অনুভূতির নূতন যৌবন দেখা দেখা দেয়। বসন্তের ফুলের প্রগলভ আনন্দ পার হয়ে পরিণত ফলের আনন্দের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে। ফাল্গুনী নাটকে এরই ভাষ্য আছে কবির ভাষায়।---

> 'প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী নদী পার হয়ে আনন্দ-লোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায়না, তারা ফলতে চায়।"

কবির "নবীন প্রাণের বসন্ত" ক্ষয়হীন চির যৌবনের গানে মুখর; ফাল্গুনীতে রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যকার নাটকের কবি বলেছেন,

> "বিশ্বের মধ্যে যে বসন্তের লীলা চলেছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।"

বর্ষার গানের মতে রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গানে পরিদৃশ্যমান জগত থেকে পূর্ববর্তী কবির জগতে অভিসারের পরিচয় তেমন নেই। তবে

বসন্তকে তিনি শুধু মিলনের ঋতু করেই আঁকেন নি। বসন্তের মধ্যে অকারণ উৎকণ্ঠা এবং গভীর বিরহ বেদনার সঞ্চারও করেছেন। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের পটভূমি প্রধানত বসন্তের। কাব্য নাটকটির বসন্তের রূপটিকে তিনি বসন্তের দৃশ্য থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। নৃত্যনাট্যে একটি অপূর্ব গান আছে। অর্জুন-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পর চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠের গানে এবং নৃত্য বিন্যাসে সেই বিরহ বেদনাত অপরূপ মাধুর্য লাভ করেছে।

"রোদনভরা এ বসন্ত
সখি, কখনো আসেনি বুঝি আগে,
মোর বিরহ বেদনা রাঙাল
কিংশুক রক্তিম রাগে।"

কবির প্রকৃতিচেতনার প্রায় সবগুলি বিশেষত্বই এই গানটিতে ধরা পড়েছে। শেষের দুটি চরণের রোমান্টিক আকুতি সীমাহীন।

"আমি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে,
ব্যাকুল কর হানি বারে বারে—
দেওয়া হলনা যে আপনারে
সেই ব্যথা মনে লাগে।"

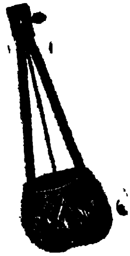
কাহিনী অংশের সমস্ত রূপক তাৎপর্যকে ছাপিয়ে কবির অন্তরতম একাকীত্বের বেদনা এখানে ভাষায় এবং সুরে সংগত হয়েছে।

এই গভীর বেদনার পথ ধরেই কবির কয়েকটি দক্ষিণী-সুরের বসন্তের গানে—স্পষ্টত না হোক আভাসে অতীত দিনের কাব্য-কাহিনীর পটভূমি আভাসিত হয়ে উঠেছে। বিদায়ী বসন্তের দিগন্তপথের বাঁকে বাঁকে বিরামবিহীন কোকিলের কণ্ঠ এবং ঝরা বকুলের গন্ধ

কবির চিত্তকে সুদূরে ডাক দিয়েছে, তাঁর প্রাণের কক্ষে কক্ষে কোন উদাসীর বীণা বেজে উঠেছে।

"বাজে করুণ সুরে (হায় দূরে)
তব চরণ তল চুম্বিত পন্থবীণা।
এমন পান্থচিত চঞ্চল
জানিনা কী উদ্দেশে।
যূথী গন্ধ অশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে॥"

বর্ষার গান "নীলাঞ্জন ছায়া"র মতোই এ বসন্তের গান আমাদের মনকে কবির বেদনার সঙ্গী করে অতীত কবির স্পষ্ট একটি জগতে উত্তীর্ণ করে দেয়।



রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকৃতি এবং ঋতুবৈচিত্র্য সর্বপ্রধান স্থান জুড়ে আছে। নাটকের গানে শান্তিনিকেতনের আশ্রম পরিবেশের কথা বলতে গেলেও আশ্রমের প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের কথাই প্রথম মনে পড়ে বিভিন্ন ঋতুতে শান্তিনিকেতন আশ্রমের পটভূমিকার রূপানুবর্তন ঘটে। তবেই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কয়েকটি ঋতুকেন্দ্রিক গীতবহুল নাটকের গানগুলির মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শান্তিনিকেতনের উৎসব-অনুষ্ঠানের অনেকগুলিই ঋতু উৎসব। বৃক্ষরোপণ, জলকর্ষণ ইত্যাদি ব্যবহারিক উৎসবেও প্রাসঙ্গিক ঋতুর সমন্বয় করা হয়েছে। "আমরা চাষ করি আনন্দে" বা "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে" বা "আয়রে মোরা ফসল কাটি"



৮

গানগুলি নাটকের জন্যই রচিত। কিন্তু আনুষ্ঠানিক বীজ বপণ এবং ফসল সংগ্রহের ব্যবহারিক দিকটিকে রবীন্দ্রনাথ ঋতু-উপভোগের আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর শারদোৎসব তাঁর এই ধরণের প্রথম রচনা। এর কয়েকটি গানে বীরভূমের নতুন পরিবেশের সঙ্গে ছেড়ে আসা পদ্মাতীরের পরিবেশ একাকার হয়ে গিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ "মেঘের কোলে রোদ হেসেছে" এবং "আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়" গান দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে। "আমার নয়ন-ভুলানো এলে" গানটিও তাই।

বর্ষা ও বসন্ত ঋতুকে কেন্দ্র করে তাঁর লেখা "শ্রাবণ-গাথা", "শেষ-বর্ষণ", "নবীন", "ফাল্গুনী", "বসন্ত" প্রভৃতি নাটকের গানগুলি রবীন্দ্রনাথ যেখানে বসেই লিখে থাকুন শান্তিনিকেতন আশ্রমের পরিবেশই তার মধ্যে স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। পূব-হাওয়াতে ভেজামাটির গন্ধ, কদম-কেশর-বিকীর্ণ বন পথ, যূথী-গন্ধে-ভরা ঝিল্লি-মুখর বাদল-সন্ধ্যা, কেতকী-মালতীর সুবাস, গুরু গুরু মেঘের মাদল-ধ্বনি—এসবের মধ্যে যেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমের বর্ষার রূপই প্রতিভাত। বীরভূমের নিদারুণ তাপশুষ্ক গ্রীষ্মকাল যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন সকলেই তাকিয়ে থাকে বর্ষার আগমন পথের দিকে। নববর্ষার ঘন নীল মেঘ যখন আশ্রমের আকাশ-প্রান্তে ঘনীভূত হয়ে আসে, তখন সেই ছবিটি আঁকা পড়ে এই গানের দুটি চরণে,

"তব উত্তরীয়ে ছায়া দিলে ভরিয়ে
তমাল-বন-শিখরে নব নীল অঞ্জন।"

শ্রাবণ-পূর্ণিমার মেঘমুক্ত চাঁদের হাসির সঙ্গে শ্রাবণের অশ্রুসজল লাবণ্য এই আশ্রমে মিশে থাকে। তারই গান,

"আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল,
হাসির কানায় কানায় ভরা নয়নের জল।
বাদল হাওয়ার দীর্ঘ শ্বাসে,
যূথী বনের বেদন আসে—
ফুল ফোটানোর খেলায় কেন ফুল ঝরানোর ছল।"

শেষ বর্ষণ" গীতি-নাট্যের সর্বশেষ গানে বর্ষার বিদায় ও শরতের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়—

"বাদল-ধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুর।
গানের পালা শেষ করে দে রে যাবি অনেক দূর॥
ছাড়ল খেয়া ওপার হতে ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে রে
দুলছে তরী নদীর পথে তরঙ্গবন্ধুর॥
কদম কেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধূলি।
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ হাওয়া আকাশ আজি শিশির ছাওয়া রে
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস বৃষ্টির বিন্দুর॥"

একটি লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই গানটিতেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় দুটি প্রাকৃতিক পরিবেশ—পদ্মাতীর এবং বীরভূমের গেরুয়া মাটিকে এক সঙ্গেই মিলিয়ে দিয়েছেন। গানের প্রথম কলিটিতে নদীর চিত্র আছে। দ্বিতীয় কলিটিতে বনপথের কদমকেশর ঢাকা রূপটি যেন শান্তিনিকেতন আশ্রমেরই প্রতিরূপ।

শরৎরূপী ক্ষণিকের অতিথির আগমনের চিহ্ন ক্রমশ পরিস্ফুট হয় শিউলির গন্ধে, শিশির-ভেজা ঘাসের স্পর্শে, কাশগুচ্ছের আন্দোলনে। আলোছায়ার আলিম্পন রেখা পড়ে বনের আঙিনায়। আশ্রমের ছেলেমেয়ের দল গান গেয়ে ফেরে শরৎ ঋতুকে বাইরে অন্তরে আহ্বান করে নিতে। আশ্রমের এ নিজস্ব রীতিটিকেই রবীন্দ্রনাথ "শারদোৎসব" নাটকে উপস্থাপিত করেছেন। নাটকে ছেলের দল বনেবনে গান গেয়ে ফিরছে শারদলক্ষ্মীর আবাহনে। তাদের হাতে শিউলি ফুল। কাশগুচ্ছ, নবীন ধানের মঞ্জরীর অর্ঘ্য সাজানো।

শরৎকালে আশ্রমের সকাল বেলার সৌন্দর্যই সকলের মনকে বিশেষ করে নাড়া দেয়। তাই বোধ হয় শরতের অধিকাংশ গানেই রবীন্দ্রনাথ সকাল বেলার সুর ব্যবহার করেছেন।

হেমন্ত শরৎ ঋতুরই দোসর। ঋতু-নাট্যে তাঁর আগমন ক্ষণিকের অতিথি শরতের থেকেও ক্ষণিক। "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা"য় হেমন্তের যে-কটি গান আছে তার মধ্যে আশ্রম পরিবেশের সুদূর আভাস আছে,

"শিউলি-ফোটা ফুরোলো যেই শীতের বনে,
এলে যে সেই শূন্যখনে।

"নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা"র অন্য আরও গানে আশ্রমে শীতের পদধ্বনি স্পষ্টভাবেই শোনা যায়—

"শীতের হাওয়ার লাগলো নাচন
আমলকীর এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে
ঝরিয়ে দিল তালে তালে॥"

অথবা

"শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
আসবে বলে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন
বনের কোলে।
আমলকী ডাল সাজল কাঙাল,
খসিয়ে দিলে পল্লবজাল
কাশের হাসি হওয়ায় ভাসি
যায় যে চলে।"

আমলকী বনে শীতের এই পদক্ষেপ আশ্রমবাসী সকলের কাছেই একান্ত পরিচিত। গানের সুরে পাতা-ঝরার ছন্দটি যেন আরও অন্তরঙ্গ হয়েছে।

আশ্রমে এর পর বসন্ত-ঋতুর প্রবেশ ঋতুরাজের মতোই। "নবীন", "ফাল্গুনী", "বসন্ত"—এই গীতিনাট্যগুলির গানের মধ্য দিয়ে বসন্তের উচ্ছল বর্ণসম্ভারকে ধরে রাখা হয়েছে। "বসন্ত" গীতিনাট্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্ব তাকে অন্যান্য ঋতু-নাটকগুলি থেকে স্বতন্ত্র করেছে। এ-বিষয়ে শুধু কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটকের সঙ্গে এর তুলনা চলতে পারে। এই গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ গানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলিকে নাটকের চরিত্রের ভূমিকা দিয়েছেন। বেণুবন, শালবীথি, আম্রকুঞ্জ, আশ্রমের এই অতি প্রিয় পরিবেশগুলি এবং বকুল, করবী, মাধবী প্রভৃতি আশ্রমের অতি-পরিচিত ফুলগুলি, এমন কি দখিন হাওয়া সকলেই যেন বসন্ত-উৎসবে যোগ দিয়েছে। সকলেই জীবন্ত,

সকলেই গীতিমুখর। দখিন হাওয়ার স্পর্শে বেণুবনের মর্মরধ্বনি, বকুলগাছের পাতায় পাতায় বিচ্ছুরিত চাঁদের আলো, শান্তিনিকেতন আশ্রমের নিজস্ব এই উপাদানগুলি ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গানে। শেষ বসন্তে প্রকৃতির ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার যখন প্রায় নিঃশেষিত, কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে আশ্রমের মঞ্জরিত শালবীথিতে।

"ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল
মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন
সৌরভ-ধনে তখন তুমি হে শালমঞ্জরী
বসন্তে করো ধন্য।"

আশ্রম-প্রকৃতির কখনো উচ্ছল কখনও বিরল সৌন্দর্যসম্ভার আমাদের সাধারণ দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গানের মধ্য দিয়ে এগুলিকে আমাদের চোখে চিরন্তন করে রেখেছেন।

আশ্রমের প্রাঙ্গণে সব ঋতুই তার চরণচিহ্ন রেখে যায়। কিন্তু আশ্রমের সমগ্র পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে একটি অনাসক্ত বাউলের রূপ দর্শন করেছিলেন তারও ছাপ পড়েছে কয়েকটি নাটকের গানে। "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর গাওয়া—

"গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।"

সে-রূপটিকে বাউল সুরেই রাখা হয়েছে। আশ্রমের রাঙা ধূলির স্পর্শ লেগেছে "অরূপ রতন" নাটকে সুরঙ্গমার গাওয়া একটি গানে।—

"প্রভু বলো বলো কবে
তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে
আঁচল রঙিন হবে।

তোমার বনের রাঙা ধূলি
ফুটায় পূজার কুসুমগুলি।
সেই ধূলি হায় কখন আমায়
আপন করি লবে॥"

কোনো বিশেষ ঋতু নিয়ে লেখা নয়, এমন অনেক নাটকের গানে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেশকে নায়ক-নায়িকার তৎকালীন মনের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। "গৃহপ্রবেশ" নাটকে হিমির গলায়—

"যদি হল যাবার ক্ষণ,
তবে দিয়ে যাও শেষের পরশন। ...
বনের প্রান্তে ওই মালতীর লতা,
করুণ গন্ধে কয়টি গোপন কথা।
ওরি ডালে আর শ্রাবণের পাখি,
স্মরণ-খানি আনবে নাকি।
আজ শ্রাবণের সজল ছায়ায় বিরহ মিলন
আমাদেরি বিরহ মিলন॥"

যতীনের আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনাকে আরও করুণ করেছে শ্রাবণের সজল পরিবেশ, আশ্রম বনপ্রান্তের মালতী লতাটিও কখন এরি মধ্যে তার স্থান করে নিয়েছে।

"অরূপ রতন" নাটকটি ঋতুনাট্য না হলেও তার মধ্যে বসন্তের একটি পরিবেশ আছে। এই বসন্ত-উৎসবটিতে শান্তিনিকেতন আশ্রমের রঙ লেগেছে। সুদর্শনার বিরহ-বেদনাকে আরও করুণ

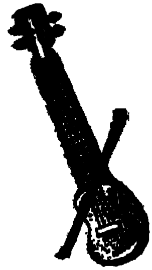
আরও মধুর করেছে আশ্রমের অতি-পরিচিত বসন্ত-পূর্ণিমা-রাত্রির মোহময় পরিবেশ। আর রাত্রির গভীরতাকে গভীরতর করেছে বেহাগ সুরের এই গানটি—

"বিরহ মধুর হলো আজি
মধু রাতে।
গভীর রাগিনী উঠে বাজি
বেদনাতে॥
ভরি দিয়া পূর্ণিমা নিশা
অধীর অদর্শন-তৃষা,
কী করুণ মরীচিকা আনে
আঁখিপাতে॥"

"চণ্ডালিকা" গদ্যনাট্যে চণ্ডালিকার গাওয়া "চক্ষে আমার তৃষ্ণা" গানটিতে চণ্ডালিকার তৃষাতপ্ত হৃদয়ের সঙ্গে আশ্রমের বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন একেবারে একাকার হয়ে গিয়েছে—

"চক্ষে আমার তৃষ্ণা
তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন
সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে॥"

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যে বিশেষ করে সংগীতে বাংলা দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রায় সমগ্ররূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু শান্তিনিকেতন আশ্রমের নাটমঞ্চে বিভিন্ন ঋতুর প্রবেশ এবং প্রস্থানে যে নাট্যলীলা জেগে ওঠে তা যেন তাঁর নাটকের গানগুলিতেই ধরা পড়েছে বেশি করে।



মানব জীবনের বিচিত্র অনুভূতি, বিভিন্ন রূপ, প্রকৃতির বিচিত্র লীলার একত্র প্রকাশ যদি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়, তবে সে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান তাঁর সংগীতে। ঋতুচক্রের প্রতিচ্ছবি তাঁর ঋতু-সংগীতে, প্রেমের গভীরতম প্রকাশ তাঁর প্রেম-সংগীতে। ভক্তের আত্মনিবেদন নানা রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর ধর্ম-সংগীতে। এ ছাড়াও স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনায় রচিত তাঁর স্বদেশী সংগীত এবং বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত আনুষ্ঠানিক সংগীত তাঁর গানের সম্ভারকে বিশেষভাবে পূর্ণতা দান করেছে।

জীবনস্মৃতির এক জায়গায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ লিখছেন "বাংলাদেশে আধুনিক যুগের যখন সবে আরম্ভকাল তখন আমি জন্মেছি।" সেই আধুনিক যুগের সূচনাকালে কলকাতার বিশিষ্ট পরিবারে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচলন ও সমাদর ছিল সুস্পষ্ট। তাঁর বাল্যকালও কেটেছিল এই রকমই একটি পরিবারে যেখানে

একদিন সংগীত "উৎসের মত উৎসারিত হয়েছিলো।" তিনি লিখছেন "আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতেই গানচর্চার মধ্যে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি. আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।" বাল্যজীবনের সংগীতের এই সময়টাই তাঁর সারাজীবনের সংগীত-রচনার পাথেয় হয়েছিল।

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহায্যে ও উৎসাহে তাঁর সংগীত-রচনা সুরু হয়। খেলার ছলে সুরসৃষ্টির হাতেখড়ির পর তাঁর রচনা পরীক্ষা নিরীক্ষার গণ্ডির মধ্যেই চলতে থাকে আমেদাবাদ যাওয়ার আগে পর্যন্ত। তারপর সুরু হলো তাঁর স্বাধীন প্রচেষ্টা। 'বাল্মিকী প্রতিভা'য় আমরা সর্বপ্রথম কয়েকটি বিলিতি সুরের এবং একটি রামপ্রসাদী সুরের ব্যবহার দেখতে পাই। তার আগের সমস্ত সংগীত হিন্দুস্থানী সংগীতকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। এ সময়ের রচনার মধ্যে একটি মাত্র গানে কীর্তন সুরের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়—সেটি ভানুসিংহের পদাবলীর অন্তর্গত —"গহনে কুসুম কুঞ্জমাঝে" গানটিতে। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে এ পর্যন্ত হিন্দুস্থানী হোক, রামপ্রসাদী হোক, কীর্তন হোক সব সুরকেই তিনি গ্রহণ করেছেন তাদের যথাযথ রীতিকে রক্ষা করে। তাঁর বাইশ বৎসর পর্যন্ত রচিত সব গানেই হিন্দুস্থানী গানের রীতিকেও তিনি পুরোপুরি ভাবে অনুসরণ করেছেন। তখনকার সমাজের উপর হিন্দুস্থানী সংগীতের একচ্ছত্র প্রভাবই এর কারণ বলে অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়।

হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রসার ও সমাদর তখনকার নূতন কৃষ্টিসম্পন্ন সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিল। বাংলার নিজস্ব গান

তখনও উচ্চাঙ্গ সংগীত মহলে এবং আধুনিক সমাজে নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় কিছু কিছু দেশী সুরের গান অবশ্য তখন প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। বাংলা সাহিত্যের আর একটি নতুনতম প্রয়াস নাট্যরচনায়ও বাংলার নিজস্ব সুরগুলি অতি স্বাভাবিক কারণেই নিজস্ব অধিকার বিস্তার করছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাংলা গানের মূল আশ্রয় তখনও ছিল লোকসংস্কৃতি, সাধুসংস্কৃতি নয়। গ্রাম বাংলায় এই লোকসংস্কৃতি নূতন স্পর্শের জন্য অপেক্ষা করেছিল।

এ সময় এই অনাদৃত বাংলার গানের প্রতি আধুনিক শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল সংগীত প্রভাকর পত্রিকায় লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কয়েকটি রচনায়। বাংলা গানের প্রতি শিক্ষিত সমাজকে তিনিই প্রথম সচেতন করে তুললেন। তবে গানগুলির সাহিত্যাকৃতির প্রতিই তাঁর দৃষ্টি ছিল, সুরের দিকে ততটা নয়। বাংলা গানের প্রতি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা লিখিতভাবে প্রথম প্রকাশ পায় "ভারতী" পত্রিকায়। বাংলার প্রাণপ্রবাহ বাংলার নিজস্ব গানকে উজ্জীবিত করে তোলার জন্য দেশবাসীর কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন। প্রথম প্রবন্ধটি বাউলগানকে অবলম্বন করে। তাঁরও দৃষ্টি প্রথমে বাউল গানের তত্ত্বের প্রতিই বেশি করে নিবিষ্ট হয়েছিল। তবে এ সম্বন্ধে তিনি প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন যে, "এ গান বাংলার নিজের গান"। কীর্তন সম্বন্ধেও তাঁর গভীর শ্রদ্ধাযুক্ত মতামত নানা লেখায় প্রকাশিত হতে লাগল। তাঁর রচিত সংগীতে তিনি বাংলার এইসব নিজস্ব গানের অনেক সুরকেই গ্রহণ করেছেন। বাউল কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী, সারী সব সুরকেই তিনি তাঁর গভীরতম কথার বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে

বেশী সংখ্যক গান পাই আমরা কীর্তন ও বাউল এবং এই দুটির মিশ্রণজাত সুরে। কীর্তন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "কীর্তন জীবনের রসলীলার সঙ্গে সংগীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্মিলিত।" আবার বলেছেন, "কীর্তন হচ্ছে রত্নমালা রূপসীর গলায়। যে জন রসিক প্রত্যেক রত্নটিকে প্রিয় কণ্ঠে স্বতন্ত্র করে সে দেখতে পায় না দেখতে চায় না। রত্নগুলিকে আত্মসাৎ করে যে সমগ্র রূপটি নানা ভাবে হিল্লোলিত সেইটিই তার দেখবার বিষয়।"

কীর্তনের যে দিকটি তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল সে তার সুরে এবং কথায় সম্মিলিত "অর্ধনারীশ্বর রূপ"। তিনি বলেছেন, "বাণীর প্রতি বাঙ্গালীর অন্তরের টান। সেইজন্য ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু বাণীর মধ্যে তো মানুষের প্রকাশের সম্পূর্ণতা হয় না, এইজন্য বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।" এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি কীর্তনের উল্লেখ করেছেন। বলছেন, "কীর্তন অপরূপ সংগীত, যুগল ভাবে গড়া পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবেই এর সার্থকতা, পদাবলীর সঙ্গেই তার রাসলীলা, স্বাতন্ত্র্য সে সইতে পারে না।" রবীন্দ্র-সংগীতের মূল কথাও তাই। অর্ধনারীশ্বরের যে মূর্তিটি তাঁর ধ্যানের মধ্যে ছিল একদিন সুর ও বাণীর মধ্য দিয়ে সেটিই রূপ পরিগ্রহ করল। শিশুকালে সঞ্চিত গীতসুধা তাঁর হৃদয় মথিত ক'রে যেদিন উপছিয়ে উঠেছিল সেদিন সে শুধু সুরেই প্রকাশ পেল না, বাণীও এল পাশাপাশি। নিজের রচনা সম্বন্ধে এক সময়ে তিনি বলেছেন, "অন্তত আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই গান রচনা অর্থাৎ সংগীতের সাথে বাণীর মিলন সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।" কীর্তনের মধ্যে এই একই সাধনার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন বলেই বোধ হয় কীর্তন তাঁর সংগীতের এতোখানি

স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। হিন্দুস্থানী গান থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালীর মন কেন কীর্তন গান রচনার জন্য ব্যাকুল হল সে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "আত্মপ্রকাশের জন্য বাঙালী স্বভাবতই গানকে অত্যন্ত করে চেয়েছে, সেই জন্য সর্ব-সাধারণে হিন্দুস্থানী সংগীত রীতির একান্ত অনুগত হতে পারে নি। সেইজন্য কানাড়া আড়ানা, মালকোষ, দরবারী, তোড়ীর বহুমূল্য উপকরণ থাকা সত্ত্বেও বাঙালীকে কীর্তন সৃষ্টি করতে হল।" "বাঙালীর কীর্তন গানে-সাহিত্যে-সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল। তাকে Primitive এবং ফোক মিউজিক বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না।" "উচ্চ অঙ্গের কীর্তন গানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুরূহ, তার পরিসর হিন্দি গানের চেয়েও বড়ো, তার মধ্যে যে বহু শাখায়িত নাট্যরস আছে তা হিন্দুস্থানী গানে নেই।"

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দেবগীতিমূলক নানারকমের গানের প্রচলন ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের গুণ বর্ণনা করা। সেগুলিকে ব্যাপক অর্থে কীর্তন বলে উল্লেখ করা চলে। কিন্তু বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক গানই বিশেষভাবে কীর্তন বলে পরিচিত। জয়দেব চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলীকেই আশ্রয় করে এই কীর্তন গানের প্রচার ব্যাপক হয়েছিল।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের একটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের জাগরণে ভাবে উদ্বেলিত ভক্তের চিত্ত সম্মিলিতভাবে আত্মপ্রকাশ করতে ব্যাকুল হয়েছিল। সেদিন এই কীর্তনের মধ্য দিয়েই মুক্তিপাগল জনমানস সমস্বরে নিজেদের মিলিয়েছিল, বাংলার মাঠ ঘাট রাস্তা সুরে

দিয়েছিল ভাসিয়ে। "এই অবস্থায় মানুষ স্থাবর ভাবে ভোগ করে না, সচল ভাবে সৃষ্টি করে—সেইজন্য বাঙালী সেদিন আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল, বাঁধন ভাঙ্গিল, সেই বাঁধন বস্তুত প্রলয় নয়, তাহা সৃষ্টির উদ্যম···বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কাব্যেই সেই বৈচিত্র্য-চেষ্টা প্রথম দেখিতে পাই···এই স্বাতন্ত্র চেষ্টা কেবল কাব্য ছন্দের মধ্যে নয়, সংগীতেও দেখা দিল।" বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি তাঁর নিবিড় ভালোবাসা ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ হয়েছে।

"মাঝে মাঝে গুরু গুরু মেঘ ডাকছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষাকালের নমুনা বর্ণনা মনে পড়ে—প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দোঝঙ্কার এনে দেয়।" ব্রজবুলিতে লেখা "ভানুসিংহের পদাবলী" তাঁর বৈষ্ণব সাহিত্য প্রীতির আরেকটি বড়ো নিদর্শন।

কীর্তন নয় এমন কতকগুলি গানেও তিনি পরোক্ষভাবে বাংলার কীর্তনকেই গ্রহণ করেছেন। কীর্তন গান ও বৈষ্ণব পদাবলীর সংস্কৃতি বা Association রাধাকৃষ্ণ লীলার পটভূমি এই গানগুলিতে স্পষ্ট, কিন্তু এগুলি রাধাকৃষ্ণ লীলার পদাবলী নয়, এবং কীর্তনের সুরও এগুলির প্রধান বাহন নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত গানগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে—

১। আর নাইরে বেলা
২। সখী ঐ বুঝি বাঁশী বাজে
৩। এখনো তারে চোখে দেখিনি

গানগুলি শুনতে শুনতে আমাদের মন বৈষ্ণব পদাবলীর রাজ্যে অভিসারে বেরিয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরণের সংগীতকে তাঁর রচনার মধ্যে গ্রহণ করলেও তিনি তাকে নিজস্ব রসে রঙে এবং রূপে নতুন করে সৃষ্টি করে নিয়েছেন, কিন্তু মূলটিকে কোথাও ছিন্ন করেন নি। তিনি এই সত্যটিকে উপলব্ধি করেছিলেন যে আমাদের জীবনের স্রোত একই খাতে বইতে বইতে তার গতি ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে আসছে। তাঁর 'সংগীতের মুক্তি' নামক প্রবন্ধে তিনি তাই বললেন, "দেশের সমস্ত শক্তিই আজ জরাসন্ধের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে, তারা আছে মাত্র, তারা চলে না — দপ্তরের বেড়িতে তারা বাঁধা। এই জরার দুর্গ ভাঙিয়া আমাদের সমস্ত বন্দী-শক্তিতে বিশ্বে ছাড়িয়া দিতে হইবে—তা সে কি গানে কি সাহিত্যে।" তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের এই উপলব্ধিই তাকে একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। একটি গাছ যেমন ধরিত্রীর বক্ষ থেকে সমস্ত রস আহরণ করে পুষ্ট হয়ে উঠে, তার সমস্ত শাখা-প্রশাখাকে মুক্ত আকাশে বিস্তৃত করে, ঠিক তেমনি ভাবেই গুরুদেবের শিশুকালে গীতরসে পুষ্ট মন মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়েছিল।

কত বৈচিত্র্য দেখা দিল তাঁর সংগীতে, সুর তাল রাগ রাগিণীর মধ্যে। বহু যুগের ধরাবাঁধা সংস্কার তাঁকে বাঁধতে পারেনি। বাঁধভাঙা জোয়ারের মতন তাঁর সংগীতের প্রবাহ দুকুল ভাসিয়ে দিয়ে নতুন গতিপথ তৈরী করেছে।

জমিদারীর কাজে দীর্ঘদিন রাজসাহী কুষ্টিয়া বাস কালে তাঁর গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেরাবার সুযোগ হয়, তখনই বাংলার দেশী সুরের সঙ্গে তাঁর ব্যাপক প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। গ্রামীন জীবনের ছোটোখাটো তুচ্ছ ঘটনা যেমন একদিন তাঁর ছোট গল্পগুলিকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি দীর্ঘদিনের গ্রামাঞ্চলে

বাসকালে বাংলার দেশী সুরগুলি তাঁর মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গিয়ে তাঁর সাহিত্যের আবেগকে অবলম্বন করে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এ সময়ে তাঁর সুররচনার মধ্যে বাউলের বেশ প্রভাব। কিন্তু সবচেয়ে বেশী সংখ্যক গানে কীর্তন সুরের ব্যবহার দেখা যায়। তবে তখনও পর্যন্ত কলকাতা অঞ্চলে প্রচলিত সুরের প্রাধান্যই বেশী স্পষ্ট। নমুনা স্বরূপ তখনকার রচিত কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে—

১। আমার মন মানে না
২। ভালবেসে সখী
৩। খাঁচার পাখী ছিল
৪। বড়ো বেদনার মত
৫। ওহে জীবনবল্লভ
৬। আমি সংসারে মন দিয়েছিনু

এই সময়ে কীর্তনে বিশেষভাবে প্রচলিত কয়েকটি রাগিনীকেও তিনি গানে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন—

| | |
|---|---|
| ১। নয়ন তোমারে পায় না | ( যোগীয়া ) |
| ২। আজি শরত তপনে | ( যোগীয়া ) |
| ৩। ওলো সই | ( বিভাস ) |
| ৪। হৃদয়ের একূল ওকূল। | ( বিভাস ) |

কিন্তু এই গানগুলির মধ্যে কীর্তনের সুরের আশ্রয় হয়েছে মানবিক প্রেম ও রবীন্দ্ররীতির পূজা। পদাবলী কীর্তনের রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ের মধ্যেই তাঁর কীর্তন-আশ্রয়ী সঙ্গীত আর সীমিত নয়।

পদাবলী কীর্তনের প্রচলিত আখরকে তিনি তাঁর কীর্তনাঙ্গ গানে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি উপাসনার গানে এই আখরের ব্যবহার দেখা যায়। গানগুলি—

১। ওহে জীবনবল্লভ
২। নয়ন তোমারে
৩। আমি সংসারে মন
৪। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
৫। কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে
৬। তুমি কাছে নাই বলে
৭। আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি

আখরকে তিনি বলেছেন "কথার তান"। গানের ভাবটিকে ব্যক্ত করাই কীর্তনের উদ্দেশ্য বলে বোধ হয় আখরের রীতি আপনা থেকেই কীর্তনে প্রবেশ করেছিল। অবশ্য এ ব্যাপারে পদকর্তাদের চেয়ে কীর্তন-গায়কের হাতই বেশী ছিল। বিশেষ একটি ভাবকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য জানা সুরের কারুকার্যে, কখনও বা কথা বলার ভঙ্গীতে, বলার রীতিটি গুরুদেব তাঁর কয়েকটি গানেও গ্রহণ করেছেন। কীর্তনের সুর আরোপ না করেও কীর্তনের প্রচলিত আখর ব্যবহার করার রীতিকে তিনি অনেক গানে সঞ্চারিত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যায়—

১। তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে ( আনুষ্ঠানিক )
সুখের আঁচলখানি ( দুখের আঁচলখানি, বুকের আঁচলখানি )

সেচন কর ( পথে পথে সেচন কর, পা ফেলবে যেথা
সেচন কর )

রাঙা হল ( রঙে রঙে রাঙা হল, তার
হাসির রঙে )

২। ছায়া ঘনাইছে বনে বনে ( প্রকৃতি, বর্ষা )

হাওয়াতে কী পথে দিলি খেয়া
( আষাঢ়ের খেয়ালের কোন খেয়া )

আড়ালে আড়ালে দেয়া নেয়া
( আপনা লুকায়ে দেওয়া নেওয়া )

তালের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে কীর্তনে গরাণহাটি বা মনোহরসাহী কীর্তনে প্রচলিত ভারি তাল তিনি একেবারেই ব্যবহার করেননি। সাধারণ ছয় মাত্রা সাত মাত্রা আট মাত্রা দশ মাত্রার সহজ তালকেই তিনি বেশী ব্যবহার করেছেন। তাল ফেরতা যেটি সাধারণ কীর্তনগানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাকেও তিনি পরিহার করেছেন। এর থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে কীর্তনের সাবলীল প্রাণস্পর্শী ভাবটিই তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল এবং সেইটিকেই তিনি আগাগোড়া তাঁর কীর্তনাঙ্গ গানে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।

অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর রচিত কীর্তন গানে স্বকীয়তা থাকলেও সাধারণ কীর্তনের ধারাই তিনি অনুসরণ করে চলেছিলেন, কিন্তু শান্তিনিকেতন পর্বে রচিত তাঁর গানে আরও কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছে। এর আগে পর্যন্ত কীর্তনের সুরে প্রকৃতি বিষয়ক একটি গানও পাওয়া যায় না। কিন্তু এবার প্রকৃতিকে নিয়ে

রচিত অনেক গানে তিনি কীর্তনের সুর আরোপ করলেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন :—

১। আমার মল্লিকা বনে
২। তোমরা যা বলো তাই বলো
৩। আমি তখন ছিলেম মগন
৪। তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক
৫। হৃদয় আমার ওই বুঝি বৈশাখী ঝড় আসে

এর কোনো কোনো গানে বাউল সুরেরও সংমিশ্রণ আছে। এছাড়া আরও কয়েকটি দিক থেকেও তাঁর স্বকীয়তা কীর্তন গানের মধ্যে প্রকাশিত হলো। আগের জীবনের রচিত অনেকগুলি কীর্তন গানে সবগুলি কলিতে একই সুরের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, কিন্তু পরে তিনি আর এই রীতিকে অনুসরণ করেননি। সুরের বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে প্রতি কলিতে। কয়েকটি গানের উল্লেখ করছি। যেমন—

১। আজি এ নিরালা কুঞ্জে
২। পুরানো জানিয়া চেওনা
৩। কৃষ্ণ কলি আমি তারেই বলি

কিছু গানে কীর্তনের সাথে বাউলের প্রভাবও সুস্পষ্ট, যেমন :—

১। আমি তারেই খুঁজে বেড়াই
২। এই তো ভালো লেগেছিল
৩। তুমি কোন্ পথে যে এলে

এই রূপান্তরটি ঘটিয়ে যে কীর্তনের সৃষ্টি হল প্রকৃতপক্ষে সেগুলিকেই রবীন্দ্র-কীর্তন বা কীর্তনাঙ্গ গান বলা যেতে পারে। শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্র সংগীত" গ্রন্থে বলেছেন, "আখর ইত্যাদি বর্জিত বাউলের প্রভাবযুক্ত ও গুরুদেবের শান্তিনিকেতন জীবনে যার সূত্রপাত এরূপ কীর্তনাঙ্গ গানকেই আমি প্রকৃত রাবীন্দ্রিক কীর্তন বলবো।" শান্তিনিকেতনের জীবনে তাঁর রচিত কীর্তন পূর্ব পথ থেকে সরে এসে যে নতুন রূপ নিল তার মধ্যে কীর্তনের মূল সুরটিই বড়ো হয়ে প্রতিভাত হল।

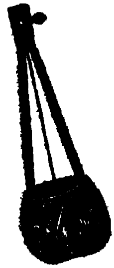
কীর্তনের মধ্যে যে নাট্যরসের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন সেটিকে তার দুয়েকটি নাট্যের বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টির কাজে বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন; তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুটি গানের কথা মনে হয়। প্রথমটি 'সখী বহে গেলো বেলা' গানটি 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের তৃতীয় দৃশ্যে স্থান পেয়েছে। প্রমদা যখন সখীদের সাথে প্রমোদে মত্ত সেই আনন্দগীত উচ্ছল মুহূর্তে হঠাৎ একটি সখীর মুখে এই সহজ কীর্তনের সুরের গানটি এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে যে তখন শ্রোতাদের মনকে পূর্ব মুহূর্তের হালকা পরিবেশ থেকে উত্তীর্ণ করে একটি ভাবগম্ভীর রাজ্যে এনে উপস্থিত করে। দ্বিতীয় গানটি "রোদন ভরা এ বসন্ত" নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদায়' পাই। অর্জুনের প্রত্যাখ্যানের পর চিত্রাঙ্গদার মুখে "রোদন ভরা এ বসন্ত' গানটি কথায় ও সুরে একটি করুণ রসের সৃষ্টি করে। "কিংশুক রক্তিম রাগে" রঞ্জিত চিত্রাঙ্গদার বিরহ বেদনাটি কীর্তনের সুরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে অব্যক্ত গম্ভীরতায় মূর্ত হয়ে ওঠে। শ্রোতার সততই মনে হবে এখানে এ সুরটিরই প্রয়োজন ছিল। পরিশেষে গুরুদেবের দুটি বিশেষ কীর্তনাঙ্গ গানের উল্লেখ করব। গান দুটি—১। "তবু মনে রেখো", ২। "ফিরে এসো বঁধু হে"। দুটি গানই তাঁর খুব প্রিয় ছিল বলে মনে হয়, কারণ

বৃদ্ধ বয়সে তাঁর শারীরিক অপটুতা সত্ত্বেও তাঁর যে কয়খানি রেকর্ড হয়েছিল তার মধ্যে এ গান দুটি স্থান পেয়েছে।

প্রথম গানটিতে কীর্তনের আবেগপূর্ণ সুরের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের আকুতি বড় করুণ ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর নিজের গলায়। গানের মূল আবেদনটি বারে বারে ঘুরে ঘুরে এসে কথা বলার ভঙ্গীকে আশ্রয় করে এতো সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে গানটি থেমে গেলেও মনের মধ্যে তার অনুরণন থামতে চায় না।

দ্বিতীয় গানটি গল্পগুচ্ছের "মেঘ ও রৌদ্র" গল্পটির মধ্যে বৈষ্ণব ভিখারীদের গলায় স্থান পেয়েছে। গানটি রচনার কিছুদিন পরে তিনি এটিতে সুর দেন। এ গানটির সুর-রচনার কথা তিনি ছিন্নপত্রাবলীর একটি চিঠিতে লিখছেন "আজ সকালে বসে বসে আমার একটা নতুন গানে সুর দিচ্ছিলুম—সুরটা যে খুব নতুন তা নয়। একরকম কীর্তনের ধরনের ভৈরবী। কিন্তু তবু ছন্দে ছন্দে গাইতে গাইতে শরীরের সমস্ত রক্তের মধ্যে একটা সংগীতের মাদকতা প্রবেশ করতে থাকে—সমস্ত শরীর এবং সমস্ত মন আগাগোড়া একটা বাজনার যন্ত্রের মতো কম্পিত এবং গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে থাকে।" মূল গানটিকে বৈষ্ণব ভিক্ষুকদের গলায় রেখে, গল্পের নায়ক শশীভূষণের মনের মধ্যে পদের পর পদ সৃষ্টি করেছেন। মোট আখরের মতন কথা থেকে গভীরতর কথা, সুর থেকে গভীরতর সুরে কথা বলার ভঙ্গীতে আবর্তিত কয়েকটি বিশেষ কথার বিশেষ উচ্চারণে বিচিত্র বিরহ-বেদনাকে গভীরতম কারুণ্যে অভিষিক্ত করে তুলেছেন। বাণী ও সুরের মিলিত অর্ধনারীশ্বরের রূপসৃষ্টি ছিল তাঁর সাধনা। অন্য রীতির গান দিয়ে তাঁর এই সাধনাও শুরু হয়েছিল, কিন্তু কীর্তনের মধ্যেই তিনি সংগীতের এই বিশেষ রূপটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

প্রথম যুগের কীর্তন গানকে তিনি সাধারণভাবে গ্রহণ করে পরে ধীরে ধীরে তার চিরাচরিত স্বকীয় গণ্ডি থেকে উদ্ধার করে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে তাকে মুক্তি দেবার সাধনা করেছেন। এটি সংগীত ও সাহিত্যে নতুন সংযোজন বলে গণ্য করতে হবে। যতই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছে, তাঁর সাধনা ততই নতুনতর সার্থকতামণ্ডিত হয়েছে। আমরাও কীর্তনের নির্যাস নিয়ে রচিত রবীন্দ্র-সংগীতের ধারায় স্নান করে ধন্য হয়েছি।



বাংলাভাষায় যে-সব জাতীয় সংগীত রচিত হয়েছে, ভাবের গভীরতা এবং সুরের বৈচিত্র্যে তার তুলনা জগতের আর কোনো ভাষায় আছে কিনা সন্দেহ। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে যে উদার জাতীয়তাবোধ বাংলাদেশ থেকে উৎসারিত হয়ে সারা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করেছিল, বাংলাভাষায় রচিত জাতীয় সংগীতগুলি তার অন্যতম প্রধান প্রকাশ এ কথা যতখানি সত্য, জাতীয় সংগীত-গুলি বাঙালি তথা ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে একথাও ততখানি সত্য।

অন্য ভাষায় রচিত জাতীয় সংগীতের মতো বাংলাভাষায় রচিত জাতীয় সংগীতের মধ্যে দেশের দুর্দশা এবং দেশবাসীর নিষ্ক্রিয়তার জন্য খেদোক্তি আছে, দেশের অতীত গৌরব স্মরণ করে দেশবাসীকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস আছে, দেশমাতৃকার বন্দনা করে

দেশবাসীর মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করার প্রচেষ্টা আছে এবং সর্বোপরি দেশের ভবিষ্যৎ-সমৃদ্ধির উজ্জ্বল চিত্রও আছে। কিন্তু এর চেয়ে বড়ো যে-জিনিষটি বাংলাভাষায় রচিত জাতীয় সংগীতে আছে সেটি জগতের অন্য কোনো সাহিত্যে দুর্লভ। স্বদেশের পুণ্য ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীকে আহ্বান করে তাঁদের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে স্বদেশের উন্নতির কল্পনা আর কোনো দেশের জাতীয় সংগীতকে এ-রকম করে সমৃদ্ধ করেছে বলে আমাদের জানা নেই। গুরুদেবের রচিত জাতীয় সংগীতের মধ্যেই ভারতবর্ষ স্বদেশপ্রীতির এই এই নূতন দিগন্তের সন্ধান পেয়েছে। অনুরূপ একটি গান আমাদের জাতীয় সংগীতরূপে পরিগণিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের গৌরব-বৃদ্ধি হয়েছে। জাতীয়তাবোধের এই উদার আদর্শ ভারতের পররাষ্ট্র নীতিকেও মহান করেছে।

জাতীয় সংগীতের মধ্যে লৌকিক সুরের বহুল ব্যবহারও রবীন্দ্রনাথের একটি অন্যতম প্রধান কীর্তি। বঙ্গভঙ্গের আকস্মিক রূঢ় আঘাতে বাঙলাদেশের মর্মস্থানে যে রক্ত ঝরেছিল তার ক্ষতের উপর বাংলার অন্তর থেকে উৎসারিত লোকসংগীতের সুর ছাড়া আর কিছুই শান্তির প্রলেপ বুলোতে পারত না। এই যুগের গানগুলি শুধু-যে স্বাদেশিকতার আবেগে পরিপূর্ণ তাই নয়, সুরবৈচিত্র্যেও অনন্যসাধারণ।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীতের ক্রমপরিণতিও বিশেষ কৌতূহল এবং বিস্ময়ের সামগ্রী। শিশু বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজদের উৎসাহে 'হিন্দু মেলা' এবং 'সঞ্জীবনী সভার' অধিবেশনে সক্রিয়ভাবেই যোগদান করেছিলেন। স্বাদেশিকতার সেই প্রথম উন্মাদনার কথা 'জীবনস্মৃতি'তে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। চৌদ্দো বৎসর

বয়সে হিন্দু মেলার নবম অধিবেশনে 'হিন্দু মেলার উপহার' নামক স্বাদেশিকভাবপূর্ণ একটি কবিতা পাঠ করেন। তখন ওই ধরণের কবিতা রচনায় হেমচন্দ্রের সর্ববাদীসম্মত অগ্রাধিকার ছিল। 'শিশু কবি' তাই ওই রচনায় হেমচন্দ্রের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। এ যুগে যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত স্বদেশী-সংগীত রচনা করেন নি তবু অগ্রজদের রচনার সুরটি তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। হিন্দু মেলার জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ রচনা করেন, 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি', সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন, 'মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ', গণেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কি করে'। যদিও দেশের মুক্তি এবং বিদেশী শাসকের পাশ ছিন্ন করার কামনা তখনও সচেতনভাবে এই গানগুলির মধ্যে প্রকাশ পায় নি, তবুও ভারতবর্ষের অতীত গৌরব এবং বর্তমান হীন-অবস্থার তুলনা করে তাঁকে আবার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্কল্পের কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এইসব রচনার মধ্যে 'দেশমুক্তি কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মতো শোনা যায়।' এই কাকলিতে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠও যুক্ত হয়েছিল কিছু পরে। হিন্দু মেলার অধিবেশনের জন্য তিনি কোনো স্বদেশী সংগীত রচনা করেন নি। তবু এই যুগের রচিত একটি গানকে 'স্বদেশী সংগীত' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরু বিক্রম' নাটকে ব্যবহৃত 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম সার্থক স্বদেশী সংগীত হল, 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ।'* এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ তখন পনেরো ষোলো বৎসর বয়সের তরুণ। তাঁর অগ্রজদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত 'সঞ্জীবনী সভা' নামে যে গুপ্ত বৈঠক বসত রবীন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠতম সভ্য ছিলেন। জীবনস্মৃতিতে আছেঃ "আমার

* এর আগে রচিত অন্য দু-একটি গানকেও রবীন্দ্রনাথের বলে মনে হয়। কিন্তু এখনও নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।" এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে এই 'তপ্ত হাওয়ার' প্রভাবে কবি যে-গান রচনা করেছিলেন সেটা দেশপ্রেমের 'খ্যাপামি'র ঊর্ধ্বে রসলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ গানে স্বদেশের প্রতি সহজাত আকর্ষণ রসমূর্তিতে গানের ভাষা ও সুরকে অভিষিক্ত করেছে। স্বদেশের কল্যাণ প্রচেষ্টায় মৃত্যুও তাঁর কাছে মহান্ বলে মনে হয়েছে। স্বদেশের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ অনেকটা 'শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে'র মতো। দেশের দুঃখ-বেদনা, দেশের অতীত সংস্কৃতি তথা দেশমাতৃকার বিচিত্র নৈসর্গিক রূপ তখনও বাণীমূর্তি ধারণ করে তাঁর গানে আবির্ভূত হয় নি। কিন্তু ধীরে ধীরে এগুলি তাঁর স্বদেশী সংগীতে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময়ে রচিত তাঁর জাতীয় সংগীতগুলি এই পর্যায়ের শেষ পরিণতি বহন করছে। সে-যুগে তাঁর দেশমাতৃকা বাংলাদেশেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'সোনার বাংলা'র রূপই তাঁর ধ্যানের বস্তু। ক্রমে বাংলাদেশের এই শ্যামল রূপটি সমগ্র ভারতের ধ্যানগম্ভীররূপে পরিণত হয়েছিল। সে কথা পরে বলছি।

লোকসংগীতের সুর ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ প্রথম 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি রচনা করেন ১২৯৩ সালে। কলকাতা কন্‌গ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে রচিত এই রামপ্রসাদী সুরের গানটি কবি নিজেই উক্ত অধিবেশনে গেয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরেই আরও দুইটি ফরমায়েশী গান কবি রচনা করেন কলকাতা কলেজের ছাত্রদের মিলনসভার জন্য (১২৯৪ সাল)। তার মধ্যে একটি 'আগে

চল্ আগে চল্ ভাই' অন্যটি 'তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ' এই গান দুটিই কবির স্বকণ্ঠে সভায় গীত হয়েছিল। এদেরই সমগোত্রীয় আরও দুটি গান কিছুদিনের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। দুটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের এ যুগের স্বদেশী গানের বিশেষত্ব বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে' গানটিতে দেশমাতৃকার করুণ চিত্র এবং দেশের সন্তানদের অসহায়তার কথা সুরমূর্তিতে ফুটে উঠেছে। অন্য গানটি 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না'। এ গানটি রচনার উপলক্ষ্য গানটিকে অমর করে রেখেছে। রচনার উপলক্ষ্য সম্বন্ধে শ্রীপুলিনবিহারী সেনের নিকট লিখিত পত্রে কবি বলেছেন, "তখনকার দিনে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অঙ্গুলি তোলা ছিল রাজ প্রসাদকণা বর্ষণের প্রত্যাশায়। একদা কোনো-এক জায়গায় তাঁদের কয়েক জনের সান্ধ্য বৈঠক বসবার কথা ছিল। তাঁদের দূত ছিলেন আমার পরিচিত এক ব্যক্তি। আমার প্রবল অসম্মতি সত্ত্বেও তিনি বার বার বলতে লাগলেন আমি না গেলে আসর জমবে না। শেষ পর্যন্ত ন্যায্য অসম্মতিকেও বলবৎ রাখবার শক্তি বিধাতা আমাকে দেন নি। যেতে হোলো। ঠিক যাবার পূর্বক্ষণেই আমি···গানটি রচনা করেছিলেম।···এই গান গাবার পরে আর আসর জমল না।"

'কল্পনা' কাব্যে (১৩০৭) কয়েকটি স্বদেশী গান সংকলিত হয়েছে; তার মধ্যে 'কে এসে যায় ফিরে ফিরে', 'এবার চলিনু তবে' এই গানগুলিতে পূর্বেকার স্বদেশী সংগীতের বৈশিষ্ট্যগুলিরই সন্ধান পাওয়া যাবে। 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' গানটি একটি বিশেষ উপলক্ষ্যে রচিত ফরমায়েসী রচনা। বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ কয়েকজন নেতা কবিকে অনুরোধ করেন দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে দেশের মূর্তি মিলিয়ে একটি গান রচনা করে দিতে। সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের একটি মূর্তি কল্পনা করে তার স্তবগান রচনা করা হয়েছে, তবুও এ গান রচনা

করে কবি সন্তুষ্ট হন নি। তার কারণ, "এ গান সর্বজনীন ভারত রাষ্ট্রসভায় গাওয়ার উপযুক্ত নয়, কেননা এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দু সংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিত ভাবে মর্মঙ্গম হবে না।"* অপরপক্ষে যাদের অনুরোধে এই গানটি রচিত হয়েছিল তাঁদেরও এ গান পুরোপুরি পছন্দ হয় নি, কারণ, "এ গান পূজা মণ্ডপের যোগ্য নয়।"*

এর পর বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন বাঁধভাঙা বন্যার মতো সমস্ত বাঙালীর মনের রুদ্ধ আবেগকে মুক্ত করে দিল। সেই যুগে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়ে জাতির তৎকালীন মনোভাবের বাণীরূপকে যেমন প্রকাশ করেছে, তেমনি দেশবাসীর অন্তরে নূতনতম দেশপ্রেমের উদ্বোধনও করেছে। এ যুগের স্বদেশী সংগীতগুলির তুলনা পৃথিবীর কোনো দেশে এবং কালে আছে কি না সন্দেহ। এই সংগীতগুলির প্রত্যক্ষ প্রেরণাও বিচিত্র। কোনোটাতে বাঙালির হীন অবস্থার জন্য কবি-হৃদয়ের গভীরতম বেদনা প্রকাশ পেয়েছে, কোনোটাতে দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, কোথাও-বা কবি দেশবাসীকে বিচিত্র কর্মে ভৈরব নির্ঘোষে আহ্বান করেছেন, কোথাও আবার দেশমাতৃকার দেহময় এবং মনোময় মূর্তি কল্পনা করে তাঁর চরণে সমগ্র দেশের প্রণতি সংহত করার চেষ্টা করেছেন। গানগুলির সুর অধিকাংশই লোকসংগীতের সুর থেকে নেওয়া। লোকসংগীতের সুরগুলির বিচিত্র সম্ভাবনার দ্বার তাতে যেমন উন্মুক্ত হয়েছে, তেমনি উচ্চতম ভাব লৌকিক সুরের সহায়তায় সাধারণ-মানুষের অন্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

এ যুগের রচিত স্বদেশী গানগুলির প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র ইতিহাস দেওয়া সম্ভব নয়। তবু দু একটি গানের কথা বলা প্রয়োজন।

* শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে লিখিত পত্র।

বাঙলার জনমতকে উপেক্ষা করে বঙ্গভঙ্গের নির্দেশে ১৩১২ সনের ৩০শে আশ্বিন 'রাখিবন্ধন' এবং 'অরন্ধন' দিবস ঘোষণা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' সংগীতটি রচিত হয়। সেই দিনই বাংলার সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্‌যোগে ময়দানে ফেডারেশন হলের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতের সমস্ত জাতির মিলনে এক মহাজাতির পরিকল্পনা সেদিনের সভায় বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। 'হলে'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন শ্রীআনন্দমোহন বসু। সভার শেষে 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে' এবং 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' এই দুটি গান গেয়ে বিপুল জনতা নগরীর পথ পরিভ্রমণ করে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতকে বাহন করে সেদিন বিক্ষুব্ধ বাংলার জনমত বাণীরূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

এ যুগের স্বদেশী-সংগীতে অতি স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশ এবং বাঙালিজাতি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণার বিষয়বস্তু হয়েছিল। কিন্তু স্বদেশী যুগের অব্যবহিত পরে তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর জাতীয় আদর্শে ভারতবাসীর মনকে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর সংগীতের বিষয়বস্তুতেও বৃহত্তর ভারতবর্ষের সভ্যতা কৃষ্টি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ প্রধান হয়ে উঠেছে। পূর্বে 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' গান সম্বন্ধে কবির নিজস্ব মত আমরা লিপিবদ্ধ করেছি। বৃহত্তর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কবির মত স্বদেশী যুগের কিছু পর থেকেই নানা প্রবন্ধে প্রকাশিত হতে লাগল। 'সর্বজনীন ভারত-রাষ্ট্রসভায় গাবার উপযুক্ত' গানও তাঁকেই রচনা করতে হয়েছে। গীতাঞ্জলির 'হে মোর চিত্ত' গানটি এই উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়। কিন্তু এই গানটির ভাষা বিশেষভাবেই বাংলা। তাই হয়তো এটিও বাংলার বাইরে তেমন জনপ্রিয় হয় নি। এর পরই রচিত হল আমাদের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন'। এটি বাংলায় রচিত হলেও

সংগতরীতিতে হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের ব্যবহার করে এবং ক্রিয়াপদকে বিরল করে দিয়ে কবি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে একে একটি সর্বভারতীয় রূপ দিয়েছেন। এক সময়ে কথা উঠেছিল এই গানটি সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রশস্তিরূপে রচিত। এই উপলক্ষ্যে কবি এই গানটির ইতিহাস বিবৃত করে শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তার থেকে অংশ উদ্ধৃত করছি।

"রাজ সরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্য আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, এই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি 'জনগণমন অধিনায়ক' গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক। সেই যুগ যুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনো ক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না।"

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতা কনগ্রেসের দ্বিতীয় দিনে 'জনগণমন' গানটি প্রথম গাওয়া হয়। "গোরা" উপন্যাসের শেষে গোরার একটি উক্তি আছে, "আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত। ...আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেরই.... যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষেরই দেবতা।"

রবীন্দ্রনাথের রচিত এই শেষ পর্যায়ের স্বদেশী সংগীতগুলির মধ্যেও সেই সনাতন ভারতবর্ষের এবং সেই ভারতবর্ষের অধিদেবতারই গান করা হয়েছে, যিনি 'জনগণঐক্যবিধায়ক'। শুধু তাই নয় ভারতবর্ষের এই পুণ্য ক্ষেত্রে পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত দেশে অন্যান্য জাতিকেও আহ্বান করা হয়েছে, এবং নবভারতের রূপায়ণে তাঁদের উপস্থিতিও কামনা করা হয়েছে। কবির বিশ্বভারতীর পরিকল্পনার মধ্যেও এই আদর্শ ই মূর্ত হয়েছে। শান্তিনিকেতনের উদার ক্ষেত্রে তিনি বিশ্ববাসীকে একনীড় হয়ে মিলবার আহ্বান জানিয়েছেন।

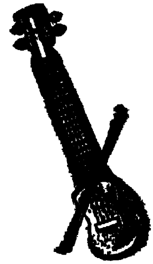
এই পর্য্যায়ের আর-একটি স্বদেশী সংগীতের একটি গৌরবময় ইতিহাস আছে। সেটি হল 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি। আনি বেসান্তের অন্তরাণের (১৯১৭) প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ লিখে তার ভাষা দিয়েছিলেন। এই উত্তেজনার মুহূর্তেই 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি রচিত হয়। এটি ১৯১৭ সনের কন্‌গ্রেসের অধিবেশনে গীত হয়েছিল, সংগে পাখোয়াজ সংগত করেছিলেন নাটোরের জগদানিন্দ্রনাথ মহারাজা। কন্‌গ্রেসের এই অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথ 'India's Prayer' নামক তাঁর বিখ্যাত কবিতা পাঠ করেন। একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য যে প্রবল উত্তেজনার মুহূর্তে রচিত হলেও 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানে এবং 'India's Prayer' কবিতায় কবি তাঁর ধ্যানের নূতন ভারতবর্ষের আদর্শকে বিস্মৃত হন নি।

স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাই নি। তিনি বর্তমান থাকলে স্বাধীন ভারতের নূতন পথনির্দেশ তাঁর জাতীয় সংগীতের মধ্যে

পাওয়া যেত সন্দেহ নেই। ভারতের জাতীয় সংগীতে তার সুদূর আভাস আছে। অন্য অনেক গানেও এই সুরটি ধ্বনিত হয়েছে। একটি গানে আছে :

চল যাই কাজে মানবসমাজে,
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে।

এটাই হয়তো স্বাধীন ভারতের প্রতি কবির শেষ নির্দেশের মতো।



জীবনের প্রায় শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভার বিস্ময়কর সৃষ্টি নৃত্যনাট্যগুলি রচিত হয়েছিল। সাধারণভাবে এগুলি পূর্ববর্তী কালে রচিত কোনো কাব্য বা নাটকের পরিবর্তিত রূপ। এগুলিতে সংগীত, নৃত্য, অভিনয় এবং সর্বোপরি মঞ্চসজ্জা এবং নাট্য-পরিবেশনার নিপুণ সম্মিলনে এক অপূর্ব সাহিত্য-কৃতির পরিণত রূপ প্রকাশিত হয়েছে।

নৃত্যকে আঙ্গিকের দিক থেকে ততটা নয়, কিন্তু প্রেরণার দিক থেকে পরিপূর্ণ রূপে সংগীতের সঙ্গে যুক্ত করে নাট্যরস সৃষ্টির প্রয়াস নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে প্রতিফলিত।

অভিনয় কলা সম্ভবত সংগীতকে অবলম্বন করেই প্রথম সভ্যতা এবং সংস্কৃতির রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিল। আজকের দিনে আমরা যাকে

সংলাপ বলি তার প্রথম ভিত্তি সাংগীতিক। গানের ভাষায় নাটক রচনা আমাদের মজ্জায় এমন করে মিশে গিয়েছিল যে সংলাপ-প্রধান নাটক যখন আমাদের আয়ত্তে এল তখনও সে সংগীতের প্রাধান্যকে পুরোপুরি বর্জন করতে পারে নি। প্রাচীন গ্রীক নাটকে "কোরাস" বা আমাদের যাত্রা-প্রভৃতিতে "জুড়ি" বা "বিবেক" না থাকলে নাটকের তত্ত্বটিকে সাধারণের কাছে পৌছে দেবার যেন কোনো উপায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের নাটকে এই সাংগীতিক প্রাধান্যকে একটি নূতনতর ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। শুধু মাত্র তত্ত্ব ব্যাখ্যা নয়, পরিবেশ রচনায়ও সংগীতের ব্যবহার প্রাচীন নাটকে ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী", "শেষবর্ষণ" প্রভৃতি কয়েকটি নাটকে সংগীতের প্রেরণা নাটকের মূল বক্তব্যের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়েছে। গদ্য-সংলাপও সংগীত-অনুসারী। শেষ জীবনের রচিত কয়েকটি নৃত্যনাট্যে নৃত্য এবং সংগীত উভয়ের সম্মিলিত প্রেরণাকে রবীন্দ্রনাথ এই কাজে লাগিয়েছেন।

নৃত্যের ভাষায় নাটক রচনা আমাদের দেশে ছিল না এমন নয়। ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে বর্তমান "কেরল" এবং উত্তর-পূর্বে মণিপুরের দুটি নৃত্য পদ্ধতিতে অভিনয়কলা অনুস্যূত হয়ে আছে। দক্ষিণ ভারতের "কথাকলি" নৃত্যকে সাধারণভাবে আখ্যান-নৃত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। অঙ্গভঙ্গির বিভিন্ন মুদ্রার সাহায্যে এই নৃত্যাভিনয়। মুদ্রাগুলির তাৎপর্য না জানা থাকলে সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করা যায় না। মূকাভিনয়ের পরিমার্জিত রূপের সঙ্গে দেহভঙ্গির মুদ্রা এবং সংগীতের সুরে তৎকালীন ভাবের প্রকাশের সংমিশ্রণ এই পদ্ধতির নৃত্যকলাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। মণিপুরে নৃত্যে একটি বিশেষ ভঙ্গির অনুবৃত্তির দ্বারা হৃদয়াবেগ প্রকাশিত হয়। সেখানে প্রত্যক্ষ অভিনয়ের প্রচেষ্টা ক্ষীণ। কিন্তু ভঙ্গির পৌনঃপুনিকতার

দ্বারা একটি বিশেষ ভাব দর্শকের হৃদয়ে মুদ্রিত করে দেওয়া হয়। বোধ হয় এই কারণেই মণিপুরী নাচ পালাগান অবলম্বন করেছে। পালাগানে অনুবৃত্তির উপযুক্ত পরিসর আছে। কথাকলির মতো অভিনয়ের আকস্মিকতা থাকলেও মণিপুরী নাচে অভিনয়ের আভাস আছে।

বাংলাদেশে আঙ্গিক-সর্বস্ব নাচ তো নেইই, আঙ্গিক-ভিত্তিক নাচও ছিল না। এ-অঞ্চলে প্রচলিত নৃত্য হল বাউল বা কীর্তনীয়াদের নৃত্যভঙ্গি। এ নৃত্য গানের ভাবপ্রকাশ করার সহযোগী বাহন। এ-নৃত্য শুধু সংগীতের তাল ও লয় প্রকাশের প্রত্যক্ষগোচর লীলা। নৃত্যের ভূমিকা যদিও সেখানে পুরোপুরি অন্তরালবর্তী নয়, তবু নৃত্যরস সেখানে অপ্রধান. সংগীতরসের পরিবেশনাই মুখ্য। বাংলাদেশের লৌকিক নাটকের পরিচয় ছিল কীর্তনের পালাগানে বা যাত্রায়। সেগুলিতে নৃত্যের ছিটে-ফোঁটা থাকলেও এগুলি নৃত্যনাট্য নয়। এগুলিকে বরঞ্চ গীতিনাট্য আখ্যা দেওয়া যায়। কোনো কোনো গীতিনাট্য আদ্যোপান্ত সুরে অভিনীত হয়। সেগুলি পুরোপুরি গীতিনাট্য। কীর্তনের পালাগানে মাঝে মাঝে কীর্তনীয়া গদ্যে যে-সব কথা বলেন সেগুলি লেখ্য নাটকের মঞ্চনির্দেশ বা নাটকের তত্ত্ব ব্যাখ্যার মতো, হিন্দুস্থানী গানের সুরবিস্তারের মতো মাঝে মাঝে এই তত্ত্বব্যাখ্যা মূল পালাগানকে অতিক্রম করে যায়। কিন্তু তাতে বাঙালি শ্রোতাদের অধৈর্য ঘটোন। রবীন্দ্রনাথ আদ্যোপান্ত গানে অভিনয়যোগ্য যেসব নাটক লিখেছিলেন সেগুলিকেই "গীতিনাট্য" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। "কালমৃগয়া", "মায়ার খেলা" "বাল্মীকি প্রতিভা" প্রভৃতি এ শ্রেণীর। এগুলিকে তিনি "গানের সূত্রে নাট্যের মালা" বলে অভিহিত করেছেন। এর আগে "ভগ্নহৃদয়" বলে কবি নাট্যাকারে একটি কাব্য রচনা

করেছিলেন। তার মধ্যে পদ্যসংলাপের সঙ্গে গানও ছিল। তাকে রবীন্দ্রনাথ "গীতিকাব্য" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। সে-কাব্যের ভূমিকায় আছে,—"এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা-বাহুল্য যে, দৃষ্টান্ত স্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।" "কালমৃগয়া"-কেও "গীতিনাট্য" বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী "মায়ার খেলা" এবং "বাল্মীকি প্রতিভা"-কে সাধারণভাবে "গীতিনাট্য" বলে উল্লেখ করা হয়। গীতিনাট্য "বাল্মীকি প্রতিভার" সূচনা অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বাল্মীকি-প্রতিভায় একটি নাট্যকথাকে গানের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয়েছিল, মায়ার খেলায় গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যসূত্রে। একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চলছিল।...মায়ার খেলায় গানের ভিতর দিয়ে অল্প একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে..." "মায়ার খেলা"র নৃত্যনাট্য রূপ আছে। কিন্তু তখনও- নৃত্যকে রবীন্দ্রনাথ অভিনয় কলার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন নি। "বাল্মীকি প্রতিভার বর্তমান পরিবর্তিত রূপের মধ্যে "কালমৃগয়া" নাটকের অংশ বিশেষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। "বাল্মীকি প্রতিভা"তেও কোনো কোনো চরিত্রের সংগীতাংশে একটু নৃত্যভঙ্গীও যুক্ত করা হয়েছে। "কথা ও কাহিনী"তে "পরিশোধ" বলে একটি দীর্ঘ কাব্যকাহিনী আছে। সেটিকেও রবীন্দ্রনাথ একসময়ে অভিনয়-যোগ্য রূপ দিয়েছিলেন "পরিশোধ" নামেই। তাঁকে তিনি "নাট্য-গীতি" আখ্যা দিয়েছেন। এই "নাট্য-গীতি"র সূচনায় তিনি লিখেছেন।—"কথা ও কাহিনী"তে প্রকাশিত 'পরিশোধ' নামক পদ্য কাহিনীটিকেও নৃত্যাভিনয় উপলক্ষে নাট্যীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে

বসানো। বলা বাহুল্য, ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গে দেওয়া অসম্ভব বলে কথাগুলির "শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।" পরিশোধ সম্বন্ধে অন্যত্র লিখেছেন; "পরিশোধ-এই প্রথম নৃত্যরসের সঙ্গে নাট্যরসের পরিপূর্ণ সম্মিলন ঘটেছিল।" আগেই বলা হয়েছে পূর্ববর্তীকালে রচিত কোনো কোনো গীতিনাট্যের মধ্যে গানের সঙ্গে নৃত্যভঙ্গীও এসে পড়েছিল। এই সংগীত, বিশেষভাবে এই নৃত্য ঘটনা-স্রোতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। ঘটনা-স্রোতকে এগুলি এগিয়েও নিয়ে যায় না, শুধু পাত্রপাত্রীর তৎকালীন হৃদয়াবেগকেই বিচিত্র বর্ণে প্রকাশ করে। কীর্তনের পালাগান এবং যাত্রাভিনয়কে হয়তো এই শ্রেণীতেই ফেলা যায়। রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" বা "তাসের দেশ" নাটকে এরই একপ্রকার পরিচ্ছন্ন রূপ দেখা দিয়েছে। কিন্তু "পরিশোধ" গীতিনাট্যে নৃত্যরস এবং নাট্যরসের যে সম্মিলনের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তাকে পূর্ণতর রূপ দেবার অভিপ্রায় একসময়ে তার মনকে অধিকার করে বসেছিল। তারই ফলে "নৃত্যনাট্য"-গুলির সৃষ্টি। এই পরিপূর্ণ নৃত্যনাট্যের সংখ্যা মাত্র তিনটি। কিন্তু স্বল্প-সংখ্যক এই নূতন রচনা দ্বারা তিনি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, ভারতীয় কাব্য নাটক এবং নৃত্যের ক্ষেত্রে একটি নূতনতর পথের ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। 'নৃত্যনাট্য" কথাটি যেমন তারই উদ্ভাবিত, "নৃত্যনাট্য" রূপে নূতন সাহিত্যসৃষ্টিও তারই প্রতিভার দান। আঙ্গিকের সীমানা ছাড়িয়ে এগুলিতে নৃত্যকে তিনি চলমান শিল্প রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। নৃত্যকে তিনি "দেহভঙ্গির সংগীত" বলে উল্লেখ করেছেন। অভিনয়কলার মধ্যে এই দেহ-ভঙ্গির সংগীতকে সমন্বিত করার প্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন কণ্ঠের সংগীতকে তিনি পরিপূর্ণ মর্যাদায়ই রক্ষা করেছেন। শিল্পের তিনটি বাহনের এই সম্মিলনে তাঁর নৃত্যনাট্যগুলি রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, "অভিনয় জিনিসটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার থেকে নকলের দিকে বেশি ঝোঁক দেয় তবু

তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া ভিতরের দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে।" দেহভঙ্গিকে ভিতরের লীলা দেখাবার কাজে সংগীতের সহযোগী করে নৃত্যনাট্যগুলিতেই প্রথম পরিপূর্ণ স্বাভাবিক রূপে ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

পরে অভিনয়-কলার যে-বাহনটিকে তিনি "নৃত্যনাট্য" বলে অভিহিত করেছিলেন, তা নিয়ে বহু আগে থেকেই কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। বিদেশী অপেরার দ্বারাও হয়তো তিনি কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৩৬ সনে যখন "কথা ও কাহিনী"র "পরিশোধ" কবিতাটিকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন তখন থেকেই এই নূতন বাহনটি একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যকৃতি হিসেবে তাঁর কাছে মর্যাদা পেয়েছিল. পরিশোধের পরিবর্তিত রূপ "শ্যামা" তাঁর সর্বশেষ এবং হয়তো নৃত্য-অভিনয় ও গীতের সর্বোত্তম সমন্বয়ের পরিচয় বহন করছে।

"পরিশোধ" কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ স্তর হিসেবে গণ্য করলে প্রথম নৃত্যনাট্য "চিত্রাঙ্গদা"। সংলাপের নাটক "চিত্রাঙ্গদা" বহু পূর্বে রচিত হয়েছিল। এই নাটকটিতে একটি বার্তা বা জীবন দর্শন আছে। সেটি নাটকের সূচনায় বর্ণনা করা হয়েছে।—

> "অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্রমাস হবে। রেল-লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে, বেগনি, সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে

প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরু প্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফল-সম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিষ, এ-যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে।…

এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনই মনে এল, সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী…।”

পদ্যনাটকটিকে নৃত্যনাট্যে পরিণত করে যখন তাকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা হল তখনই পরিপূর্ণ একটি সাহিত্যাকৃতির জন্ম হল। রবীন্দ্র অনুরাগীদের নিশ্চয়ই মনে আছে কলকাতার একটি বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্য অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ মঞ্চের একটি কোণে বসে থাকতেন। একটি "ফটো চিত্রে" সে-দৃশ্যটি ধরে রাখাও আছে। অভিনয় বা আবৃত্তিতে যোগ না দিয়ে এই যে মঞ্চে বসে থাকার উদাহরণ তারও একটি উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নূতন সৃষ্টিধারাকে সমালোচকের চোখ দিয়ে অবিশ্রাম বিচার করেছেন।

"চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যটিকে সাহিত্যসৃষ্টির দিক থেকে পুরোপুরি

সমীক্ষা করার পরিসর এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে সম্ভব নয়। শুধু একটু আভাস দেব।

নৃত্যনাট্যের সূচনা করা হয়েছে একটি "গদ্য-গান" দিয়ে। গদ্য-গান কথাটা সাহিত্যে সচল হবে কিনা জানি না। কিন্তু গানটি একটি গদ্য-কবিতা। সেটি বর্ষা-বর্ণনার। ভাষা ও সুরে এটিকে রবীন্দ্রসাহিত্য এবং সংগীতের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে মনে করি। সূচনার এই বর্ষা-বর্ণনা চিত্রাঙ্গদার শিকার দৃশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই। দৃশ্যপট বসন্তে পরিবর্তিত হয়েছে। অর্জুন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পর চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে উপস্থাপিত করা হয়েছে একটি বসন্ত-বিরহ সংগীত। "রোদনভরা এ বসন্ত" এটিই বোধ হয় সাহিত্য সংগীত ও নৃত্যের পরিপূর্ণ সমন্বয়ের প্রথমতম পরিচয়। কিন্তু প্রথমতম মহত্তম পর্যায়ে উন্নীত হবার এটি একটি বিরল নিদর্শন। যাঁরা "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্য-নাট্য উপযুক্ত মর্যাদায় অভিনীত হতে দেখেছেন, তাঁরা যখনই এই সংগীতটি শুনবেন তখনই চিত্রাঙ্গদার বিরহ-তাপিত হৃদয়ের নৃত্য-ভঙ্গিটিও মনশ্চক্ষে দেখতে পাবেন। "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যে আরও একটি বিস্ময়কর গান আছে সেটিও নৃত্যভঙ্গিমার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে যুক্ত হয়ে আছে। সেটি নূতন সৌন্দর্যলাভের পর "চিত্রাঙ্গদার" বিস্ময়মুগ্ধ সংগীত।—

"আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি"।

চিত্রাঙ্গদার পর "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য রচিত হয়। এটিও গদ্যনাটক "চণ্ডালিকার" পরিবর্তিত রূপ। এরও একটি বার্তা আছে। অস্পৃশ্য চণ্ডালকন্যার বুদ্ধবাণীতে উদ্বুদ্ধ হবার এই কাহিনী বৌদ্ধ-সাহিত্য থেকে সংগৃহীত। নৃত্যভঙ্গির সঙ্গে সংগীতের পরিপূর্ণ

সমন্বয়ের পরিচয়ে এই নাটকটিও সমৃদ্ধ। যে-দেবতা চণ্ডালকন্যাকে তার লাঞ্ছনায় ভরা এই পৃথিবীতে এনেছেন, "তারে কেন দেব ফুল?" এই প্রশ্নটি সংগীত-নৃত্যে গভীর একটি তত্ত্বের রূপ পেয়েছে। "ফুল বলে ধন্য আমি মাটির পরে" সেই প্রশ্নের কাব্যময় উক্তির। চণ্ডালিকার গানগুলির মধ্যে সংলাপেয় গদ্য-ভঙ্গি সুরে উন্নীত হয়েছে। ছন্দ বজায় রেখে গদ্যগন্ধী এই সংলাপ-সংগীতের কোনো উত্তরসূরী এখনও বাংলাসাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় নি। মিলগুলিও মাঝে মাঝে আকস্মিক। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের একটি গানের ছন্দে একটি অপরূপ পংক্তি-মধ্য মিল যুক্ত করা হয়েছিল

"মণিপুর নৃপ দুহিতা
তোমারে চিনি তা—পাসিনী।"

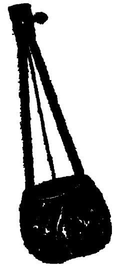
চণ্ডালিকায় একটি আকস্মিক মিল আছে।

"রৌদ্র হয়েছে অতি তীক্ষ্ণ
আঙিনা হয়নি যে নিকনো।"

সর্বশেস নৃত্যনাট্য "শ্যামা" পূর্ব রূপগুলির কথা আগেই বলা হয়েছে। আগের দুটি নৃত্যনাট্যে একটি দার্শনিক তত্ত্ব আছে। "শ্যামা" নিছক প্রেমের কাহিনী। সুর ও ছন্দের সহযোগে এই নূতন সাহিত্যাকৃতির নিদর্শনটি হয়তো রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের সবচেয়ে পরিণত রূপ। গদ্য-গন্ধী সংলাপের ভঙ্গিটি এ-নাটকেও রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে গভীর ভাবের কাব্য-সংগীত এটিতে অতি সুন্দর ভাবে সমাহিত হয়েছে। শ্যামার "তোমার কাছে দোষ করি নাই" কিংবা "তোমা লাগি করেছি যে কাজ" প্রভৃতি গান ছাড়াও, উত্তীয়ের "মায়াবন বিহারিণী

হরিণী" এবং "আমার জীবনপাত্র "উচ্ছলিয়া" প্রভৃতি গান গদ্যগন্ধী অন্য গানের সূত্রের মধ্যে মণি-মুক্তোর মতো গেঁথে দেওয়া হয়েছে। সংখ্যায় অপ্রচুর হলেও রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলিতে শত-শতাব্দীর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একদা একান্ত সচিবকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "সুরের বোঝাই-ভরা তিনটে নাটকের মাঝিগিরি শেষ করা গেল।..." তাঁর সুরের বোঝাই-ভরা নৃত্যনাট্যের তরণী সাহিত্যের বিরলতম তীরে এসে ভিড়েছে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথ নিছক অভিনেতা বা নাট্যকারই ছিলেন না। তাঁর নাটকের প্রযোজনারও পরিপূর্ণ দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাঁর রচনা নয়, তাঁর পরিবেশনায় যে বিশেষত্ব অনুস্যূত হয়েছিল সেটি ভুলে গেলে তাঁর নৃত্যনাট্যের মূল সুরটি ব্যাহত হয়, একথা আজকের প্রযোজকদের বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছিলেন :—"মানুষের জীবন, বিপদ-সম্পদ, সুখ-দুঃখের আবেগে নানারূপ ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলেছে। তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে যে-একটা বিচিত্র সংগীত হয়ে ওঠে ; তেমনি আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সেটা হয় নাচ।" নৃত্যনাট্যগুলিতে তিনি ধ্বনি এবং গতিকে সমন্বিত করেছিলেন। সেজন্যই আরও একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ 'মণিপুরী', 'কথাকলি,' কান্ডীয় প্রভৃতি নাচের ভঙ্গি বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ আবেগ প্রকাশের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু কোনো রীতির নাচকেই আঙ্গিক-সর্বস্ব করে সংগীত বা ধ্বনিকে ক্ষুণ্ণ করেন নি। নৃত্য বা সংগীত যে-কোনো একটি ক্ষুণ্ণ হলেই রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের রূপটি ক্ষুণ্ণ হয়, একথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।



জীবিকার প্রয়োজনে সংগীতের ব্যবহার আমাদের মনকে অধুনা এত আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে জীবনের প্রয়োজনে সংগীতের গুরুত্বের কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। সংগীতের ব্যবহারিক দিককে উপেক্ষা করে নয়, তাকে অবলম্বন করেই সংগীতের আত্মিক দিকটিকে আমাদের জীবনের উৎকর্ষের সোপান হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া প্রাচ্য জীবন-দর্শনের অঙ্গ। সংগীতের সাধনায় জীবনকে শুধু সংগীতজ্ঞরাই পূর্ণ করেন নি আমাদের দেশের অনেক সাধুসন্ত শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে বহু দূরে থেকেই এ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের শেষ প্রতিনিধি। সর্বাঙ্গীণ জীবন-চর্চায় সংগীতের প্রাধান্য স্বীকারে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় একক।

আধ্যাত্মিক সাধনা পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো ভারতীয় সাহিত্যের প্রায় অঙ্গে অঙ্গে মিশে আছে। এক সময়ে সংগীত মানেই ধর্ম সংগীত

ছিল। প্রেম-সংগীত তখন লৌকিক বলেই গৃহীত হয়েছিল। তারপর এক সময়ে ধর্ম-সংগীতের মধ্যে মধুর রস সঞ্চারিত হয়ে প্রেমের-গান আর ধর্ম-সংগীতের প্রেরণা আংশিকভাবে অত্যন্ত কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। বাংলার বৈষ্ণব কাব্যে তার সর্বোত্তম উদাহরণ বিধৃত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-সংগীতও একদিক থেকে বৈষ্ণব সাহিত্যের রাগানুগা ভক্তির সাধনার পরিণত রূপ। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগের সন্তদের সাধনার ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে আশ্চর্য মিল খুঁজে পেয়েছিলেন তাও প্রধানত ধর্ম-সংগীতকে অবলম্বন করেই। আচার-অনুষ্ঠানগত বিচার রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে একেবারেই নিরর্থক। কারণ মধ্যযুগের সন্ত বা সাধকদের মধ্যে যদিও বা কিছু আনুষ্ঠানিক রীতির প্রতি শ্রদ্ধা আবিষ্কার করা যায় রবীন্দ্রনাথ তার থেকে বহু যোজন দূরে অবস্থান করেছেন। মোটামুটি আচার-অনুষ্ঠানের বর্জন করে ভারতীয় সাধনার একটি শাখা আচার-নিষ্ঠ ধর্ম সাধনার পাশাপাশি অনেক দিন ধরেই জীবিত ছিল। লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান বাউল-পন্থা প্রকৃতিতে তার পরিচয় আছে। বাউল-পন্থাকেও রবীন্দ্রনাথ উপযুক্ত শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন—এই কারণেই যে সেটি উদার ছিল ধর্ম বিচারের সংকীর্ণতার দ্বারা এই মতবাদগুলি তেমন করে আবদ্ধ ছিল না। এই সব উদার ধর্ম-সাধনায় মুসলমান ধর্মেরও অনেক দার্শনিক চিন্তা সমন্বিত হয়েছিল। সুফী-মতবাদ রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইংরেজ-অধিকারের আগে থেকেই খ্রীস্ট ধর্মের ভক্তিতত্ত্ব আমাদের দেশে কিছু পরিমাণে প্রবাহিত হয়েছিল। ইংরেজ শাসনে আসার পর খ্রীস্ট ধর্মের একটি স্রোত ভারতীয় চিন্তা-ধারায় অবলীলাক্রমেই মিশে গিয়েছিল। খ্রীস্ট-দর্শন পঠন পাঠন খ্রীস্টধর্মের বহুবিধ শাখার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় আমাদের দেশের বহু মনীষীর চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। সে প্রভাবের মূল্য থাকাই স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। শুধু একটি উদাহরণ দেব। খ্রীস্ট ধর্মে

পাপ-বোধ এবং ভগবানের কাছে পাপের মার্জনা ভিক্ষার অংশটি কোনো কোনো আধুনিক ভারতীয় ধর্ম-সাধকের চিন্তাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করেছে। পাপ সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন ঋষিরা একেবারে নীরব ছিলেন তা নয়, কোনো কোনো সম্প্রদায় পাপ-পুণ্যের বিচারে সরবই ছিলেন। কিন্তু ধর্ম-সাধনায় পাপ-বোধকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় নি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বা সংগীতেও পাপের কথা নেই তা নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তিনি প্রাচীন ভারতীয় সাধকদেরই অনুগামী। ইংলণ্ডের কবি এবং সাহিত্যানুরাগীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা যে নূতনত্বটি বহন করে নিয়ে গিয়েছিল সেটি অজিতকুমার চক্রবর্তী অতি সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন। একটি উদ্ধৃতি,

> "য়েটস, টমাস এ কেম্পিসের 'খৃস্টের অনুকরণ'—নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম পুস্তকের সহিত রবিবাবুর এইসকল গান ও কবিতার তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, 'খৃস্টের অনুকরণ'-এর রচয়িতা যেমন পাপবোধের দ্বারা অত্যন্ত আক্রান্ত হইয়া সকল বাহ্য-সৌন্দর্যকে ভক্তি সাধনের অন্তরায় বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সে-ভাব আদবেই নাই। তিনি সকল সৌন্দর্যে, সকল ভোগের বস্তুতে ভগবানেরই প্রেমের সাক্ষ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রেমই সৌন্দর্যরূপে কবির কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।...... কবীর নানক প্রভৃতি ভক্তদের গান পাপবোধের দ্বারা আক্রান্ত নয়। আমারই ভিতর সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আমারই জীবনের মধ্যে সমস্ত বিশ্ব-সৌন্দর্য অবাধে ফুটিতেছে—তাঁহাদের গান এই আনন্দের সুরে বাঁধা।...কবি য়েটস কেন, ইউরোপীয় কোনো ভাবুকই আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের আধ্যাত্মসাধনার মধ্যে এই মধুর উৎসটির সংবাদ পান নাই। তাঁহারা সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের সংগীত পাইয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, এবং এক নূতন

জ্যোতিষ্ক-আবিষ্কারের যেমন আনন্দ তেমনি এক আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু যে মাণিক তাঁহাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে সে যে, একটি আধটি নয়, ভারতবর্ষের ভাবসমুদ্রের তলায় সে যে কত যুগ-যুগান্তর হইতে কত বিচিত্র রূপে সঞ্চিত হইয়া আছে, সে খবর যেদিন প্রকাশ হইয়া পড়িবে সেদিন বিশ্ব-সাহিত্যের ঐকতান সংগীতে নূতন একটি সুরেরআবির্ভাব ঘটিবে।" (কাব্যপরিক্রমা: ধর্মসংগীত)

অজিতকুমার চক্রবর্তীর এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে রবীন্দ্রসংগীতকে অবলম্বন করেই। ভারতীয় সুরের গভীরতা সেতার প্রভৃতি যন্ত্রসংগীতকে অবলম্বন করে পশ্চিমকে মুগ্ধ করতে আরম্ভ করেছে, আর রবীন্দ্রসংগীতের বাণীকে উপলব্ধি করার আগ্রহ ধীরে ধীরে উন্মীলিত হচ্ছে। এই বাণী আর সুরের সম্মিলন ধর্মসংগীতের পক্ষপুটেই একদা বহির্ভারতকে অধিকার করবে, তার সূচনা দেখা দিয়েছে।

আগে বলেছি পাপের কথা রবীন্দ্রসংগীতে নেই তা নয়। কিন্তু পাপ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খ্রিস্টধর্মের অনুগামী নয়। সমগ্র থেকে অংশের বিচ্ছেদকেই তিনি পাপ বলে মনে করতেন। "শান্তিনিকেতন" নামক তাঁর মন্দিরের সংকলিত ভাষণে একথা তিনি বহুবার বলেছেন। ভবনে আর ভুবনে আধাআধি হয়ে যাওয়াই তাঁর কাছে পাপ। অনুষ্ঠান-গত কোনো পাপের কথা তাঁর কাব্যে সাহিত্যে বা সংগীতে কোনো প্রতিষ্ঠা পায়নি। একটি গানে আছে—

"ছন্দ তাহার ভেঙে গিয়ে দ্বন্দ্ব বাধায় প্রাণে,
অন্তরে আর বাহিরে তাই তান মেলেনা তানে।"

এই দ্বন্দ্বই, অন্তর এবং বাহিরের মিলনের এই বাধাই কবির কাছে সবচেয়ে বড়ো "পাপ"। কিন্তু পাপ কথাটা ব্যবহারে কবির স্বাভাবিক কারণেই দ্বিধা ছিল। যেদিন সমগ্রের সঙ্গে অংশের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের সংগীত মিলে যায় সেদিনের আধ্যাত্মিক আনন্দই কবির ধর্মবিশ্বাসের শেষ পরিণতি।

"শান্তিনিকেতন" নামে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ-সংকলনের মধ্যে "পাপের মার্জনা" বলে একটি প্রবন্ধ আছে। সেটি প্রথম মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। তার থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে প্রচলিত ধারণা থেকে তাঁর ধারণা কত দূরে।

> "আমরা তাঁর কাছে এ প্রার্থনা করতে পারিনা 'আমাদের পাপ ক্ষমা করো', কারণ, তিনি ক্ষমা করেন না, তিনি সহ্য করেন না। তাঁর কাছে এই প্রার্থনাই সত্য প্রার্থনা, 'তুমি মার্জনা করো।' যেখানে যত কিছু পাপ আছে, অকল্যাণ আছে, বারম্বার রক্তস্রোতের দ্বারা, অগ্নিবৃষ্টির দ্বারা তিনি মার্জনা করেন। যে প্রার্থনা ক্ষমা চায় সে দুর্বলের ভীরুর প্রার্থনা, সে প্রার্থনা তাঁর দ্বারে গিয়ে পৌঁছোবে না। আজ এই-যে যুদ্ধের আগুন জ্বলছে এর ভিতর সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে; বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো।"

এই প্রবন্ধের শেষ দিকে কবি তাঁর নিজস্ব ধারণার প্রান্তে আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন। বিশ্বদেবতা বা ভগবান পাপ ক্ষমা করেন না। যদি বিশ্বপাপের জন্য আমাদের বেদনা জাগ্রত হয় সে-বেদনার অশ্রুতেই সমস্ত মানুষের পাপের মার্জনা হয়। পাপের বোধ থেকে প্রেমের বোধ সেখানে বড়ো।

"সমস্ত মানুষের সুখ-দুঃখকে এক করে যে এক একটি পরম বেদনা, পরম প্রেম আছেন, তিনি যদি শূন্য কথার কথা মাত্র হতেন তবে বেদনার এই গতি কখনোই এমন বেগবান হতে পারত না। ধনী-দরিদ্র জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলকে নিয়ে সেই এক পরম প্রেম চিরজাগ্রত আছেন বলেই এক জায়গার বেদনা সকল জায়গায় কেঁপে উঠেছে। ...তাই একথা আজ বলবার নয় যে, 'অন্যের কর্মফল আমি কেন ভোগ করব'। হাঁ, আমিই ভোগ করব, আমি নিজে একাকী-ভোগ করব, এই কথা বলে প্রস্তুত হও। নিজের জীবনকে শুচি করো, তপস্যা করো, দুঃখকে গ্রহণ করো।"

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক গানগুলি এই বিশ্ববোধ বিশেষ ভাবে বিশ্ব বেদনা বোধ-এর এর মধ্য দিয়ে পরম প্রেম এবং আনন্দে উত্তীর্ণ হবার গান। বাংলা সাহিত্যে তো বটেই বিশ্বসাহিত্যে এর তুলনা এখনও বিশেষ সৃষ্ট হয়নি

রবীন্দ্রনাথ প্রথম ধর্মসংগীত রচনা করতে আরম্ভ করেন ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবক্তারূপেই। স্বয়ং রামমোহন এগুলির নাম দিয়েছিলেন "ব্রহ্ম-সংগীত"। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে পিতা এবং অগ্রজ অনেকেই "ব্রহ্মসংগীত" রচনায় রামমোহনকেই মোটামুটি অনুসরণ করেছেন। "ব্রহ্মসংগীত" নামে এইগুলি সংকলিত হয়েছে। সংকলন গ্রন্থের প্রথমেই "ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্য," ব্রহ্মউপাসনার পদ্ধতি ইত্যাদিও এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ব্রহ্মসংগীতগুলি সাধারণত এই মূল সত্য এবং উপাসনার প্রতি লক্ষ্য রচিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক ধর্ম সংগীত রচনা থেকে অতি অল্প বয়সেই মুক্ত

হয়েছিলেন। "ব্রহ্মসংগীত" এর গোষ্ঠি-বদ্ধতা-থেকে "পূজায় গান" এর একান্ততায় উত্তরণই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সংগীতের মূল কথা। "ব্রহ্মসংগীত" গ্রন্থে সংগীতগুলির শ্রেণী-বিভাগের নামকরণ এবং গীত বিতানের পূজার গান অংশের রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নামকরণের মধ্যেও এই উত্তরণের পরিচয় আছে। "ব্রহ্মসংগীত" এ এই বিভাগগুলির দুএকটির নাম = পরিচয় হল, "ব্রহ্ম চিন্তা ও ব্রহ্ম পূজায় আহ্বান" "শান্তিলাভের জন্য তাহার কাছে চল" "জীবনে তোমার এত দয়া" প্রভৃতি। কিন্তু পূজার গানের বিভাগগুলির নাম "গান", "বন্ধু", "বিরহ", "দুঃখ", "আনন্দ", "বিশ্ব", "সুন্দর", "পথ" ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের পূজার গানে একদিকে যেমন অন্তর্মুখিতা আছে, অন্যদিকে তেমনি একটি বিশ্বজনীনতা আছে। সে বিশ্বজনীনতা ধর্মনিরপেক্ষ। পূজার গানের অধিকাংশই যে-কোনো ধর্মবিশ্বাসের অবলম্বন এবং হৃদয়কে অধিগ্রহণ করতে পারে।

এই বিশেষ গুণটি তাঁর কিশোর বয়সের ধর্মসংগীতেই দেখা দিয়েছিল। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত একটি ঘটনায় একথাও বোঝা যায়; পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এটির দ্বারা আকৃষ্টও হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলি—

> "একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরী করেছিলাম। তাহার মধ্যে একটি গান—'নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।'

> পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার ও জ্যোতি-দাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতি-

দাদাকে বলাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যইন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকে সে-কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।"

এই ঘটনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতের বিশিষ্টতা ধরা পড়েছিল।

রামমোহন কয়েকটি ধর্মসংগীত রচনা করেছিলেন কিন্তু ভারত পথিক রামমোহন তখনও তাঁর ভারতপন্থার ভাষা খুঁজে পান নি। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ভাষা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মসাধনাকে তিনি বিশ্বপথের চৌমাথায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। সে ধর্মসাধনার বিশ্বপন্থা রবীন্দ্রনাথের পূজার গানকে অবলম্বন করেই বিশিষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা তাঁর নানা প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মূল সূত্র তাঁর পূজার গানেই আছে—

যে-গানটির কথা রবীন্দ্রনাথ উপরের ঘটনায় উল্লেখ করেছেন সেই "নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে" গানটির সঙ্গে রামমোহন রচিত একটি ধর্মসংগীতের প্রথম পংক্তির সাদৃশ্য আছে। রামমোহনের গানে আছে—

"মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।"

কিন্তু এই কবিত্বময় পংক্তিটি পরবর্তী পংক্তিগুলিতে শুধু সংবাদবাহী আনুষ্ঠানিক ধর্মচিন্তাতে পর্যবসিত হয়েছে।

"সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তায়, কিরূপে সম্ভবে।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নয়ন তোমারে গানটি অনুরূপ ভাবের প্রসঙ্গে রচিত হলেও কয়েকটি অবিস্মরণীয় পংক্তি গানটিকে অতীন্দ্রিয়তা দান করেছে।

"হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে. হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।"

কিংবা

নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ, সেও আছে তব ভবনে।"

অথবা

"তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোনো বাধা নাই ভুবনে।

প্রভৃতি পংক্তিগুলিকে অনুসরণ করেই রবীন্দ্রনাথের "পূজায় গান" বিশ্বলোকের রহস্যের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে। শুধু তাই

নয়, মহাবিশ্ব মহাকাশ এবং মহাকালকেও তাঁর পূজার গান বার বার স্পর্শ করেছে।

পূর্বজীবনে রচিত পূজার গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ধর্ম-সংগীতের গোষ্ঠী-প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ব্রাহ্মধর্মের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তাঁর গানে সংক্রামিত হয়েছে। তা না হলে -

"জীবনে আমার যত আনন্দ
পেয়েছি দিবস-রাত
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে
স্মরিব জীবন নাথ ॥

এই গানটির এরূপ উপসংহার হত না।

"পিতা মাতা ভ্রাতা সব পরিবার
মিত্র আমার পুত্র আমার
সকলের সাথে প্রবেশি হৃদয়ে
তুমি আছ মোর সাথ ॥"

কিন্তু ক্রমশই তিনি ধর্ম-সাম্প্রদায়গত মনোভাবের ক্ষীণতম স্পর্শটিকেও পরিত্যাগ করেছেন। গোরা উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে গোরার উক্তিতে আছে।

"আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই, যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

রবীন্দ্রনাথের উদ্দিষ্ট দেবতাও সমগ্র ভারতবর্ষের দেবতা, রবীন্দ্রনাথ গোরার মতোই "সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে" "একেবারে

ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ" হয়েছিলেন। হয়তো সমগ্র বিশ্বের কোলেই তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমি। গীতাঞ্জলির প্রথম গানটিতে আছে,

"আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ-ধুলার তলে।"

এই "তুমি" ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবর্ষের দেবতা তো বটেই, হয়তো বা সমগ্র বিশ্বেরও দেবতা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূজার গানের তত্ত্বগত ব্যাখ্যা ছাপিয়ে আরও একটি ব্যাখ্যা আছে, সেটি তাঁর সৌন্দর্যের উপলব্ধি। এই পূজার গানে তাঁর অতীন্দ্রিয় প্রেমানুভূতি এবং প্রকৃতির প্রতি জন্মান্তরের নাড়ির টান এসে একত্রিত হয়েছে। তত্ত্ব দিয়ে নয়, গভীরতম উপলব্ধির পথ ধরে এই সত্য এসে তাঁর হৃদয়ে অপাবৃত হয়েছে যে, অনাদি অসীম সত্ত্বা পৃথিবীর সমস্ত শোভা সৌন্দর্যে নিজেকে অভিব্যক্ত করেন, তিনিই নারীর হৃদয়-মাধর্যকে, তাঁর দেহ-লাবণ্যকে অধিকার করেও পরিব্যাপ্ত। শেষ পর্যায়ে তাঁর প্রেমের গান এবং পূজোর গান একই গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে মিলিত হয়েছে। তাঁর শেষ বেলাকার গানে দুঃখ নেই আছে নিবিড় বেদনা, সুখ নেই আছে গভীরতম আনন্দ, শুধু মঙ্গলচেতনা নেই আছে পরমা শান্তি। সে বেদনা, সে আনন্দ সে শান্তির গান।

"এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে
তার হৃদয় বাঁশি আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে॥

"নিশীথ রাতের নিবিড় সুরে বাঁশিতে তান দাও হে পুরে
যে তান দিয়ে অবাক কর গ্রহ শশীরে।...
বহুদিনের বাক্যরাশি এক নিমেষে যাবে ভাসি—
একলা বসে শুনব বাঁশি অকূল তিমিরে।"

এই জন্মের পৃথিবীর লীলাভূমিকে তিনি অন্তরতম উপলব্ধির দ্বারাই আস্বাদ করেছেন রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের পথে। কিন্তু তবুও এই পৃথিবীকে ছেড়ে যাবার অনন্ত বেদনা জীবনান্তরের ধ্রুব শান্তিতে পরিবৃত্ত হয়ে আছে। সে গানের ভাষা তার চিত্রকল্প এই জগতের কিন্তু তাঁর ব্যঞ্জনা মহা-জাগতিক।—

"সমুখে শান্তি পারাবার-
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চির সাথি লও লও হে ক্রোড় পাতি—
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুব তারকার।"



রবীন্দ্র-সংগীতের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য সংগীত এবং সাহিত্য-রসিকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। রবীন্দ্র-সংগীতে যে কটি ভাগ বা পর্যায় আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে পূজা, প্রেম ও প্রকৃতির গানের সংখ্যাই বেশি। এই তিনটি মুখ্য বিভাগের মধ্যে গান নিয়ে লেখা গান আবার একটি বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে।

প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য উপলব্ধি করে কবির মনে স্বভাবতই গান জেগে উঠেছে। প্রেমের গানে তিনি তাঁর মানসী প্রেয়সীর কাছে উপস্থিত হয়েছেন গানের ডালি নিয়ে, প্রেমাস্পদকে সেই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপহার। তাঁর জীবন-দেবতার কাছে পৌঁছবার প্রধান পাথেয় হল হৃদয়ের গভীর থেকে উত্থিত তাঁর গান। সে-গানকে অবলম্বন করেই তাঁর পূজারতি। গানে গানেই তাঁর পূজা নিবেদিত হয়েছে। সে-পূজার আনুষ্ঠানিক উপাচারও যদি কিছু থেকে থাকে তাও গান।

মন দিয়ে তিনি যাঁর নাগাল পাননি সুর দিয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করেছেন। তাঁর পথ শাস্ত্রীয় সাধনার পথ মতো কঠিন নয়, সে-পথ সুরের ছোঁয়ায় সহজ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে।

গীতবিতানের সূচনায় কবি যে-গানটিকে তাঁর সমস্ত গানের ভূমিকারূপে উপস্থাপিত করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, প্রথম যুগের উদয়-দিগঙ্গনে ধরিত্রীর বুকে যে প্রথম ঊষা নেমে এসেছিল তার মধ্যেও ছিল অনন্ত সুরের পিপাসা। সুরের সে পিপাসা কবিকেও উন্মুখ করেছে। সুরহীন প্রাণের শুষ্কতা দূর করবার জন্য, তিনি জীবন-দেবতার কাছে সুর যাচ্ঞা করেছেন। তাঁকে তিনি আহ্বান করেছেন সুরের গুরু বলে।

"সুরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা,
মোরা সুরের কাঙাল এই আমাদের ভিক্ষা।
তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত,
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।..."

কোথাও সুরের বেদনায়, কখনও বা সুরের আনন্দের মধ্য দিয়েই কবির আত্মনিবেদনের গানগুলি জীবন-দেবতার সঙ্গে তাঁর অনাদি বিচ্ছেদ, অসীম বিরহকে দূর করার পথে যাত্রা করেছে।

"তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে,
কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে!"

বিশ্বের অধিদেবতা কবির জীবনেরও দেবতা। কিন্তু সৃষ্টির মধ্যেও কবি একটি নিঃসীম সংগীতের তান শুনতে পেয়েছেন। সেই ধ্রুব তানটি নিজের জীবনের গানে সংগত করার আকাঙ্ক্ষায় কবির হৃদয়

"যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে,
মিলাব তাই জীবন গানে।"

গগনের নীল তাঁর হৃদয়কে রাঙিয়ে দেবে সুরে, উষা নিশীথের প্রান্তে এসে যে-গীতে মুখর হয়ে ওঠে, তা কবির প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করবে। গানের এই গানটি শেষ হয়েছে একটি অবিস্মরণীয় পংক্তি দিয়ে,

"সন্ধ্যা মম সে-সুরে যেন মরিতে জানে।"

এই পংক্তিটির ব্যঞ্জনা কবির সংগীত-দর্শন তথা জীবন-দর্শনকে অনন্ত অর্থমণ্ডিত করেছে। বিশ্বসংগীতকে তিনি জীবনগান যেমন সমন্বিত করতে চান, তেমনি আবার তাঁর নিজের অন্তরে জাগ্রত গানের সুর দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতিকে অনুরণিত করার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর সাধনার অন্তর্গত। তাঁর সে-গানে বিশ্বদেবতার বন্দনাও মুখরিত। একটি পুরাতন ব্রহ্মসংগীতে আছে।—

"জাগো জাগোরে জাগো সংগীত
চিত্ত-অম্বর করো তরঙ্গিত
নিবিড়-নন্দিত প্রেম-কম্পিত
হৃদয়-কুঞ্জ বিতানে।

মুক্ত বন্ধন সপ্ত-সুর তব
করুক বিশ্ববিহার ;
সূর্য-শশী নক্ষত্রলোকে
করুক হর্ষ-প্রচার।
তানে তানে প্রাণে প্রাণে
গাঁথো নন্দন হার,
পূর্ণ করোরে গগন-অঙ্গন
তাঁর বন্দন গানে।"

এই সংগীতটিতে একটি মহাজাগতিক অনুরণনও আছে। গান দিয়ে মহাজাগতিক আনন্দ-বেদনার স্পর্শলাভের অনেক পরিচয় রবীন্দ্র-সংগীতে আছে। এ-আনন্দ অনন্ত উপলব্ধির সমাপ্তিহীন আনন্দ, এ-বেদনা নিবিড় প্রাপ্তির অভাবের নিঃসীম বেদনা। কোন্ এক অজ্ঞাত অনাদি কালে কবি যেন শুধু গানকে সাথী করেই তার দেবতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন ; পথে পথে কত উপলব্ধি তাঁকে গভীর আনন্দে অভিষিক্ত করেছে, গভীরতর উপলব্ধির কত বেদনা তাঁকে বার বার উদ্বেল করেছে। কিন্তু তাঁর সে-যাত্রা আজও শেষ হয়নি। তাই তাঁর গানে অনন্ত বিরহও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।—

"কবে আমি বাহির হলেম
তোমারি গান গেয়ে,
সে তো আজকে নয়!
ভুলে গেছি কবে থেকে
আসছি তোমায় চেয়ে
সেতো আজকে নয়!"

রবীন্দ্রনাথের ভক্তহৃদয়ের সাধনা রাগানুগা ভক্তির সাধনা। তাঁর মধ্যে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান নেই। বিশ্বের যে অধিদেবতার চরণপ্রান্তে অনাদি কাল থেকে দেশ কাল ও ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই প্রণাম নিবেদিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সে-দেবতাকে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু সে-দেবতার একটি ব্যক্তিগত স্বকীয় রূপ তিনি কল্পনা করেছেন। দেবতার প্রাচীন ঐতিহ্যের যে-টুকু তাঁর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার সহায়ক—তাকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। কিন্তু তাঁর দেবতা নির্বিশেষ। যদি তাঁর কোনো মন্দির থেকে থাকে তবে সেটা ভক্তের হৃদয়। আর তাঁর পূজার শ্রেষ্ঠ, হয়তো বা একমাত্র উপাচার সংগীত।

অনন্ত শোভাময়ী ধরণীতে কবির এ-জন্ম কবির কাছে অনন্ত তাৎপর্য-পূর্ণ, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি নূতনতর উপলব্ধির আনন্দ-বেদনার ঢেউয়ে আন্দোলিত হয়েছেন। কিন্তু জগৎসভায় স্থান তাঁর যত ক্ষুদ্রই হোক, তিনি গানে গানে তাকে তার আনন্দ-বেদনাকে সার্থক করে তুলতে চান।

"আমি শুধু থাকি হেথায়
গাইতে তোমার গান।
দিও তোমার জগৎ-সভায়
এইটুকু মোর স্থান॥"

কবির উপলব্ধিতে সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে যে-অনাদি সংগীত ধ্বনিত হয়ে উঠছে, যে-সুরের ধারা জগৎকে প্লাবিত করে বিভিন্ন সৌন্দর্যে

অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে, সে ধ্বনির সে-অভিব্যক্তির সে আনন্দে কবি যোগ দিতে উন্মুখ।—

"তোমার সুরের ধারা
ঝরে যেথায় তারি পারে,
দেবে কি গো বাসা আমায়
দেবে কি একটি ধারে।
আমি শুনব ধ্বনি কানে,
আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে
সেই ধ্বনিতে চিত্ত বীণায়
তার বাঁধিব বারে বারে॥"

অন্তরতম উপলব্ধির এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর গানের সাহায্যেই পূর্ণ হবে প্রতীক্ষার উন্মুখতার প্রহরগুলি সংগীতমুখর।—

"গানের সুরের আসনখানি
পাতি পথের ধারে,
ওগো পথিক, তুমি এসে
বসবে বারে বারে।"

অথবা

"যতক্ষণ তুমি আমায় বসিয়ে রাখো
বাহির বাটে,
ততক্ষণ গানের পরে গান গেয়ে মোর
প্রহর কাটে॥"

গানের প্রেরণা কবি বিশ্বসৃষ্টি এবং বিশ্বের অধিদেবতার কাছ থেকেই লাভ করেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির শোভা এবং ঋতুবৈচিত্র্য তাঁকে যেমন সংগীতে উদ্বুদ্ধ করেছে, তেমনি এই বিচিত্র শোভার অধিদেবতার চকিত স্পর্শে তাঁর হৃদয়ে সংগীতের শিখা জ্বলে উঠেছে। এ-শিখার আগুনে সমস্ত প্রকৃতিকেও তিনি আবার অনুরঞ্জিত করে দিয়েছেন।

"তুমি যে সুরের আগুন
লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে,
সে-আগুন ছড়িয়ে গেল
ছড়িয়ে গেল সব খানে।"

গানের তৃষ্ণা কবির জন্ম-জন্মের, এ-বিশ্বসৃষ্টির সুর-মন্দাকিনীতে কবি তাঁর এ জীবনের তৃষ্ণা দূর করার প্রয়াসী। হাসিকান্না বিরহ-মিলনে পূর্ণ পার্থিব এই জীবনে তাই তাঁর সাধনা গানেরই সাধনা।

"কান্না হাসির দোল দোলানো
পৌষ ফাগুনের পালা।
এরি মধ্যে চির জীবন
বইব গানের ডালা॥"

এ-সাধনার পথে বিশ্বসংগীতের সঙ্গে তান মেলেনা বলে কবির বেদনা যেমন ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি আবার কোনো একটি পরমলগ্নে বিশ্ববীণাটির তানে তাঁর হৃদয়ের তার বাধা হয়ে যায়। পরম-বেদনার থেকে অনন্ত আনন্দে তাঁর এই পরিক্রমা শুধু সংবাদবাহী সংগীতে পর্যবসিত হয়নি। এই অনুভূতি শুধু তাঁর কাব্যকে নয়,

গানের সুরকেও আধিভৌতিক রাজ্য থেকে, শাস্ত্রীয় সুরের গণ্ডী থেকে আধ্যাত্মিক সুরময় জগতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

"গানে তব বন্ধন থাক টুটে
রুদ্ধ বাণীর অন্ধকারে কাঁদন জেগে উঠে।...
ছন্দ তাহার ভেঙে গিয়ে দ্বন্দ্ব বাঁধায় প্রাণে,
অন্তরে আর বাহিরে তাই তান মেলেনা তানে।"

কিংবা

"আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে,
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।
আমার একতারাটির একটি তারে
গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে
হার মেনেছি এই খেলাতে॥"

এগুলি বেদনার গান। "ভুবনে-ভবনে আধআধি" রয়ে যাবার গান। এ-বেদনার লীলায় জীবন-দেবতার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের উপলব্ধিই প্রধান; তবু সমস্ত বিচ্ছেদ ছাপিয়ে একান্ত উপলব্ধির অধরা আনন্দও আছে।

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ আমি পাইনে তোমারে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি,
বাজাবে গো আপনি আসি!"

এ প্রশ্ন কবির নিত্যজীবনের প্রশ্ন। কিন্তু যেদিন "আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে" কবির বাঁশি একদিন তার দেবতার নিঃশ্বাসে সংগীতে বেজে ওঠে, সেদিনের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিও কবির জীবনের চির সঞ্চয়।

"জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে !···
আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া !
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে
গানের বেদনায় যাইযে হারায়ে !"

এই মহাজাগতিক গানের অনুরণন কবির প্রতিদিনের প্রভাত সন্ধ্যাকে সুন্দর করেছে। তাই সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিকে তিনি গানের মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করেছেন।

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি,
তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায়
আকাশ ভরে ভালোবাসায়
তখন তারি ধূলায় ধূলায় জাগে পরম বাণী।"

গানের মধ্য দিয়ে জগতের ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে তিনি তাঁর মুক্তির

আস্বাদ জীবনের পরম বাণীর সন্ধান পেয়েছেন। এখানেই রবীন্দ্র-সংগীতের চরমতম সার্থকতা।

ভগবানের কাছেও যেমন, কবির প্রেয়সী নারীর কাছেও তাঁর শ্রেষ্ঠ উপহার তাঁর গান। কারণ তিনি ক্ষণে ক্ষণে "দেবতাকে প্রিয় করেন, প্রিয়েরে দেবতা।" যা দেবতাকে দিতে পারেন তাই তিনি তাঁর প্রেয়সীকেও দেন। রবীন্দ্রনাথের পূজার গান যেমন গানের গানে উদ্বেল, তাঁর প্রেমের গানও তেমনি গানের গানে পরিপূর্ণ। কবির স্বয়ংবধূ-মন "গানের রতনহার"ই তাঁর প্রিয়তমার গলায় পরাতে উন্মুখ।

পূজা এবং প্রেমের গানে কবি গানকে নানা রূপকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। গান কখনও "অঞ্জলি", কখনও "মালা", কখনও "অলি", সুর কোথাও "আগুন" হয়ে পৃথিবীর সমস্ত শোভায় ছড়িয়ে পড়ে, কখনও সে "সুরধুনী" বা "ঝরনাধারায়" প্রবাহিত। গান আবার কখনও "তরী" হয়ে তার অভীপ্সিত তীরে পৌঁছে দেয়। গান কখনও "আলো", কখনও "হাওয়া" হয়ে ভুবন ছেয়ে ফেলে, কখনও আবার "তারা"র মতো নিরন্ধ্র অন্ধকারকে দীপ্ত করে ফুটে ফুটে থাকে। গান কবির পূজার ও প্রেমের "ডালি", কখনও আবার সুর তার পূজা বা প্রেমের "আসন", তারই উপর জীবন-দেবতা বা মানসী-প্রেয়সীর পদস্পর্শের আকাঙ্ক্ষায় তিনি ব্যাকুল। গান তাঁর "লিপি",

সে লিপিতেই তাঁর হৃদয়-বেদনা উৎসারিত। গান তাঁর "ব্যাকুলতা", গান তাঁর "লীলা"খেলা, গান তাঁর "বন্ধন", গানই তাঁর "মুক্তি"। প্রেয়সীকে সে "সুধা" তিনি সঞ্চয় করে রেখেছেন সে "গীতসুধা", প্রেয়সীর হৃদয়লতা সে-সুধারসের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। সে-লতায় যদি কবির গানের মুকুল ফোটে তাহলেই কবি কৃতার্থ, প্রেয়সীর চিত্তে চিরস্থায়ী আসন তিনি নাই বা পেলেন।

"মনে রবে কিনা রবে আমারে
সে আমার মনে নাই,
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে
অকারণে গান গাই।"

পূজা বা প্রেমে বোধ হয় মিলনের থেকে কবি বিরহকেই গভীরতর গানের প্রেরণারূপে পেয়েছেন। তাই একটি অবিস্মরণীয় গানে তিনি তাঁর সুরকে পৃথিবীর সমস্ত শোভায় মিশিয়ে দিয়ে তাঁর চিরায়মানা প্রেয়সীর জন্য সঞ্চিত করে রেখেছেন। তাঁর বসন্তের গানের বেদনাতে যদি একদিন বসন্তরাতে তাঁর প্রিয়ার আঁখি ছলছল অশ্রুতে উদ্বেল হয়ে ওঠে, তবে তাকেই তিনি "বহু" করে মেনে নিয়েছেন। পৃথিবীর এপার থেকে বিদায়ের দিনে জীবন-দেবতার পরপারে যাবার তাঁর "শেষ পারানির কড়ি' শুধু তাঁর কণ্ঠের গান—

'শেষ পারানির কড়ি কণ্ঠে নিলেম গান।"

তেমনি পৃথিবীর প্রেয়সীর সঙ্গসুধা থেকে নূতন জীবনের দিকে প্রবাস-যাত্রায় গানই তাঁর শেষ অশ্রু।

"আসা-যাওয়ার পথের ধারে
        গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন,
যাবার বেলায় দেব কারে
        বুকের কাছে বাজল যে-বীণ!
সুরগুলি তার নানা ভাগে
রেখে যাব পুষ্প রাগে
মীড়গুলি তার মেঘের রেখায়
        স্বর্ণরেখায় করব বিলীন।"